ফেরাউনের গুপ্তধন
আসাদ বিন হাফিজ
ক্রুসেড-৮

ক্রুসেড —৮

ফেরাউনের গুপ্তধন

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮, ৮৩১৯৫৪০, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

ক্রুসেড - ৮

ফেরাউনের গুপ্তধন

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১

তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৫

প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-8

Farauner Guptadhan

[A heroic Adventure of the great Salahuddin]

by

Asad bin Hafiz

Published by

Pritee Prokashon

435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217

Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758

3rd Edition April 2005

Published on: January 2001

PRICE : 3 50.00

ISBN 984-581-236-8

খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মরণপন লড়াই কাহিনী

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠলো খ্রিস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিল মদ ও নেশার দ্রব্য। ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী গোয়েন্দা। বড় বড় সেনা অফিসার এবং আমীর ওমরাদের হারেমগুলোতে ওদের ঢুকিয়ে দিল নানা কৌশলে। ভাসমান পতিতা ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। মদ, জুয়া আর বেহায়াপনার স্রোত বইয়ে দিল শহরগুলোতে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই – অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

ক্রুসেড

সেই সব শিহরিত, রোমাঞ্চিত ঘটনার শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনায় ভরপুর ইতিহাস আশ্রিত রহস্য সিরিজ

এ সিরিজের অন্যান্য বই

- গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান
- সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান
- সুবাক দুর্গে আক্রমণ
- ভয়ংকর ষড়যন্ত্র
- ভয়াল রজনী
- আবারো সংঘাত
- দুর্গ পতন

ক্রুসেড সিরিজের পরবর্তী বই

দুর্গ পতন

১৯৭৪ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। কায়রো থেকে আঠারো মাইল দূরে এক জায়গায় এসে তিনটি উট দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক উটের ওপর একজন করে আরোহী, তাদের শরীর ও মুখ নেকাবে ঢাকা। একজন আরোহী পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করল। তারপর কাগজটির ভাঁজ খুলে গভীর মনযোগ দিয়ে দেখে সঙ্গীদের বললো, 'এই সে জায়গা!'

সে সঙ্গীদের সামনে অগ্রসর হওয়ার ইশারা করে নিজেও এগিয়ে গেল। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সঙ্গীরাও তাদের উট সামনে বাড়ালো।

সামনে দু'টি টিলা মুখোমুখি দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। দুই টিলার মাঝখানে চিকন একটি রাস্তা। রাস্তাটি এতই সরু, একটি উট কোনরকমে যেতে পারে ওই পথে।

তিনজনই লাইন ধরে উটসহ ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরের অবস্থাও একই রকম। দু'পাশে সুউচ্চ দেয়াল। মনে হয়, কোন পাহাড়ি টিলা নয়, মানুষের তৈরী কোন শক্ত পাঁচিল। পাঁচিলটি অনেক দিনের পুরোনো এবং এখানে ওখানে ভাঙা। সেই ভাঙা দিয়ে তাকালে দেখা যায় সীমাহীন বালির সমুদ্র এবং পাহাড়।

অঞ্চলটি তিন-চার মাইলব্যাপী বিস্তৃত। টিলা এবং পাহাড়গুলো কোথাও লম্বা, কোথাও গোল। সর্বত্র ছোট বড় অসংখ্য টিলা ও পাহাড়ের ছড়াছড়ি। তার মাঝে অল্প কিছু সমতল উপত্যকা।

টিলা ও পাহাড়ে দেবদারু গাছের মত কিছু খাঁড়া স্তম্ভ। স্তম্ভগুলো এত উঁচু এবং খাঁড়া যে, মনে হয়, কোথাও কোথাও তা হাজার ফিট উঠে গেছে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার এখনো বেশ খানিক বাকী। অথচ এরই মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এসেছে এখানে। আঁধার ক্রমেই গ্রাস করছে এলাকাটি। স্তম্ভগুলো ভূতের আকৃতি নিতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, অসংখ্য ভূত এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

টিলার খাঁড়া পাড়গুলো দুর্গম। যেমন উঁচু তেমনি দেয়ালের মত একটানা খাঁড়া। মনে হয়, দিনের বেলায়ও কোথাও কোথাও সূর্যের আলো প্রবেশ করে না।

এই ভূতুড়ে দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় অনেক দিন মানুষের পা পড়েনি। কোন কালে কেউ প্রবেশ করেছিল কিনা তাও ঠিক বুঝা যায় না।

'মনে হয়, এর ভেতরে কখনও কেউ প্রবেশ করার দুঃসাহস করেনি।' ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের বলল ওদের দলনেতা।

'কেন করবে! ভেতরে প্রবেশ করার কারো কোনদিন প্রয়োজন হলে তবে তো করবে? মরুভূমিতে যাত্রীদের শুধু পানির প্রয়োজন হয়। এমন শুকনো নিরস বালির পাহাড়, টিলা ও উপত্যকা, যেখানে দিনের আলোও ঠিক মত পড়ে না, সেখানে পানি খুঁজতে আসবে কোন পাগলে?' এক সঙ্গী জবাব দিল নেতার প্রশ্নের।

আরেক জন বলল, 'জায়গাটা চলাচলের কোন রাস্তার পাশেও পড়ে না। বহু দূর দিয়ে যাওয়ার সময় কোন কাফেলার চোখে পড়লে বলে, কায়রো এখনো আঠারো মাইল দূরে

রয়েছে। এই দূরত্ব মাপার কাজ ছাড়া এই মৃত্যু উপত্যকা কোন দিন কারো কাজে লেগেছে?'

লোক মুখে এই এলাকা সম্পর্কে কিছু ভয়ংকর গল্প প্রচলিত আছে। এলাকাটাকে কেউ বলে মৃত্যু উপত্যকা, কেউ বলে শয়তানের পাহাড়। লোকজন বলাবলি করে, এই অঞ্চলে শয়তানের প্রেতাত্মারা বাস করে। অভিশপ্ত শয়তানকে যখন আল্লাহ্ আকাশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন শয়তান নাকি এখানে এসে অবতরণ করেছিল। তারপর থেকে শয়তানের প্রেতাত্মারা এই অঞ্চলটিকে তাদের স্থায়ী ঘাঁটি বানিয়ে নেয়।

এই অঞ্চল সামরিক দিক থেকেও এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নয় যে, সৈন্যদের তা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। ফলে কখনো কোন সৈন্য বা সেনাবাহিনীও এর ভেতরে প্রবেশ করেনি।

অঞ্চলটি শুধু দুর্গম নয়, নানা কুসংস্কারপূর্ণ গল্পের কারণে ভীতিপ্রদও। ফলে মানুষজন কখনো বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ এই মৃত্যু উপত্যকায় আসতে সাহস পায়নি। মরুভূমির হিংস্র প্রাণী ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই।

এই প্রথম তিনজন আগন্তুক এই ভয়ংকর অঞ্চলে প্রবেশ করল। এখানে তাদের কতটা বিপদের মোকাবেলা করতে হবে তার কোন পরোয়া করল না তারা।

তিনজন কঠিন চেহারার আরোহীকে নিয়ে তিনটি উট মন্থর পায়ে সংকীর্ণ পথে এগিয়ে চলল। কারণ, উট তিনটি নিরূপায়। তাদের চালক যেখানে তাদের চালিয়ে নিয়ে যায় সেখানে তাদের যেতেই হবে।

হাজার হাজার বছর আগের পুরোনো একটি নকশা আছে

এই অভিযাত্রীদের কাছে। নকশাতে যে জায়গার চিত্র আঁকা তার সাথে এলাকাটি হুবহু মিলে যায়। শুধু একটি রেখা সামান্য সন্দেহের সৃষ্টি করে। রেখাটি একটি নদীর। কিন্তু তারা প্রচুর ইতিহাস ঘেটে দেখেছে, কোন কালেও এখানে কোন নদী ছিল না।

বিষয়টি তাদের ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জায়গাটি এক নজর ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। সে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্যই তাদের আজকের এ অভিযান।

কিছু দূর এগুনোর পর তারা দেখতে পেল অপেক্ষাকৃত একটি নিচু অঞ্চল লম্বালম্বিভাবে এগিয়ে গেছে। অঞ্চলটি দুই টিলার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ রাস্তা থেকে বেশি দূরে নয়।

একটি ফোঁকর গলে সংকীর্ণ রাস্তা থেকে বেরিয়ে এল অভিযাত্রী দল। এখন তারা সেই দীর্ঘ নিচু অঞ্চলটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অঞ্চলটি পাশে দশ বারো গজের বেশি নয়।

দলনেতা উটের ওপর থেকে নেমে এল নিচে। হেঁটে নিচু অঞ্চলের বালিয়াড়ির মধ্যে নেমে গেল। সঙ্গী দু'জন উটের ওপর বসে থেকে দেখতে লাগল নেতার কাজকর্ম।

মাঝামাঝি এসে দলনেতা নিচু হয়ে একমুঠো বালি তুলে নিল হাতে। গভীর মনযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল। হাতের বালি ফেলে দিয়ে লম্বা করে দৃষ্টি মেলে দিল বালির সমুদ্রে। খুশিতে ভরে উঠল তার হৃদয়-মন। সে নিশ্চিত, শত শত বছর আগে এখান দিয়ে পানি প্রবাহিত হতো। এই নিম্নাঞ্চল নিশ্চয়ই কোথাও আটকে না গিয়ে কোন গতিপথ ধরে নীলনদের দিকে চলে গেছে।

সে ফিরে এল উটের কাছে। সঙ্গী আরোহীদের আশ্বস্ত করে

বললো, 'আমরা ঠিক জায়গায়ই এসে পৌঁছেছি।'

এই আরোহীদের দলনেতা ইটালীর মার্ক লী। সে নিজে এবং সঙ্গী দু'জনও খৃস্টান। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বিশ্বস্ত কমান্ডার আহমদ দারবীশ গোপনে খৃস্টানদের সাথে হাত মিলিয়ে ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কবর অনুসন্ধানে পাঠিয়েছে এদের।

নকশা অনুযায়ী ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছে ওরা। এই মৃত্যু উপত্যকাতেই আছে ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কবর।

এতে আরোহীদের খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু মার্ক লী খুশি হতে পারলো না। অঞ্চলটি লম্বা এবং প্রস্থ উভয় দিকেই কয়েক মাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। এর মধ্যে কয়েক হাত লম্বা একটি কবর খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।

মার্ক লী তার সঙ্গীদের বললো, 'এই সে জায়গা, নিজেকে খোদা বলে দাবী করত যে ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্স, তার শেষ আশ্রয়স্থল। তাকিয়ে দেখো এর বিপুল বিস্তৃতি। আহমদ দারবীশ ও হরমন আমাদেরকে এক ব্যর্থ অভিযানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এত বড় এলাকা চষে একটি কবর খুঁজে বের করা কেবল কঠিন নয়, বলতে গেলে অসম্ভব। তারা আমাদেরকে দিয়ে এমন এক অসাধ্য সাধন করতে চায়, হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও মানুষ যা জয় করতে পারেনি।'

সঙ্গীরা অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে কেমন বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। এ অভিযানে তাদের ব্যক্তিগত কোন আগ্রহ ছিল না। তারা চাচ্ছিল ফিরে যেতে। কিন্তু কমাণ্ডারকে এমন কোন পরামর্শ দেয়ার সাহস ছিল না তাঁদের। তারা তো হুকুমের গোলাম। মার্ক লী এক কঠিন হৃদয়ের কমাণ্ডার। সহজে হার

মানার পাত্র সে নয়। নিজের বুদ্ধি ও সাহসের ওপর যথেষ্ট আস্থা নিয়েই কাজ করে সে। কাজের সময় অহেতুক বাগড়া দেয়াকে সে পছন্দ করে না।

আগে আগে যাচ্ছে মার্ক লী, পেছনে সঙ্গী দু'জন। ওরা যত এগুলো ততই ওরা দেখতে পেলো পার্বত্য অঞ্চলের রূপ ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে। এখানকার মাটির রঙ ঘন বাদামী। কোথাও তা পাল্টে গিয়ে দেখা যাচ্ছিল খয়েরী, কোথাও বা লাল মেটে-রঙ।

বালির পাহাড়ের পাশেই কোথাও ছোট্ট একটু উপত্যকা। তারপাশেই হয়তো কোন টিলা সোজা খাড়া উঠে গেছে উপরের দিকে।

ধীর পায়ে এগুচ্ছে দলটি। এগুচ্ছে আর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে আশপাশের পরিবেশ।

হঠাৎ ডান দিকে টিলার মাঝখানে একটি ফাটল নজরে পড়ল মার্ক লীর। দেখে মনে হয় কোন প্রবল ভূমিকম্প এসে দেয়াল ফাঁক করে দিয়ে গেছে।

মার্ক লী ফাটলটির কাছে এসে বাইরে চোখ রাখল। দেখল, সে ফাটল একটি সরু গলি তৈরী করেছে। গলিটি বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে, এত দূর যে শেষ মাথা দেখা যায় না।

গলিটিতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিল মার্ক লী। কিন্তু গলিটি এতই চিকন যে, ওই পথে উট নিয়ে প্রবেশ করা কষ্টকর।

মার্ক লী কোন বাধাই মানলো না, সে তার উট সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

উটের হাটু দুই পাশের দেয়ালে ঘষা খাচ্ছে। মার্ক লী নিজের পা গুটিয়ে উটের পিঠের ওপর তুলে দিল। অন্য আরোহীরাও

তাই করল।

আরোহীর নির্দেশে এগিয়ে যাচ্ছে উট, তাতে দেয়ালের গায়ে বার বার ঘষা খাচ্ছে তার শরীর। উটের হাটুর বাড়ি ও গায়ের ঘষার ফলে দেয়ালের মাটি নিচে খসে পড়ছে।

ফাটলের দু'পাশের দেয়াল অনেক উঁচু। উটের ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠতে লাগল সে দেয়াল। আরোহীদের মনে হতে লাগল, এই বুঝি তা ভেঙে ওদের ঘাড়ের ওপর পড়বে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

একবার যদি তাতে ধ্বস নামে তবে আরোহীসহ পিষে যাবে সবাই। তাই, মার্ক লীসহ সবাই খুব সাবধানে অগ্রসর হতে লাগল।

পথটা ক্রমেই উপরের দিকে উঠে গেছে। যথেষ্ট সতর্কতার সাথে অনেকটা পথ এগুনোর পর ওরা দেখতে পেল, দূরে, অনেক উপরে টিলার দুই পাশ এক হয়ে মিশে গেছে।

দু'পাশের দেয়াল উঁচু থাকায় ওদের পথটা ছিল অন্ধকার, তবে উপরের দিকে আলো দেখা যাচ্ছে। এ থেকে তারা বুঝতে পারলো, দিনের আলো এখনো শেষ হয়ে যায়নি আর যেখানে পথটা শেষ হয়েছে তারপরে নিশ্চয়ই প্রশস্ত কোন উপত্যকা আছে।

গলি ক্রমশ: সুড়ঙ্গের আকার ধারণ করলো। উটের পায়ের শব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে ভীতিকর আওয়াজে রূপান্তরিত হলো। এতেও মার্ক লী থামলো না, সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়েই চললো।

এক সময় অন্ধকার কমে গিয়ে আলোর বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করল। মার্ক লী বুঝল, সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। একটু

পরেই তারা সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে উপস্থিত হলো।

উটের পিঠে থাকায় সুড়ঙ্গের মুখের সমতল জায়গাটি তারা হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল। সহজেই তারা নেমে এল সেখানে। কিন্তু উটকে উপরে তোলা তত সহজ হলো না। অনেক কসরত করে, রশি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে অনেক কষ্টে উটকে উপরে তুলে আনা হলো।

মানসিক চাপ ও শারীরিক কসরতের কারণে সবাই খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। তিনজনই বসে পড়ল মাটির ওপর।

একটু সুস্থির হয়ে নজর বুলালো আশপাশে। দেখলো সেখানে একটি বড় দুর্গের দেয়াল এখনো মাথা খাঁড়া করে দাঁড়িয়ে আছে।

মার্ক লী দুর্গটির কাছে গেল। এটি কোন মানুষের সৃষ্ট দুর্গ ছিল না, বরং এ ছিল প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এক কেল্লা। চারপাশের পাহাড়ের আকৃতি এমন ছিল যে, বাইরের দিকটা ছিল সম্পূর্ণ খাঁড়া আর ভেতরের দিকে তিন চারশ' গজ পর্যন্ত ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। ফলে, চারদিক থেকে আবদ্ধ হয়ে এলাকাটি দুর্গের রূপ নিয়েছে। পাহাড়ের উঁচু নিচু চূড়াগুলোকে মনে হচ্ছিল দুর্গের গম্বুজ।

মার্ক লী সঙ্গীদেরকে উটগুলো সেখানেই বসিয়ে দেয়ার জন্য বলল।

উটগুলো বসিয়ে দেয়ার পর ওরা পায়ে হেঁটে দুর্গ এলাকাটা ঘুরে দেখতে শুরু করলো।

পাহাড় ঘেরা দুর্গটা গোলাকার। পা টিপে টিপে হাঁটতে হচ্ছে ওদের। কারণ, বালি মিশ্রিত মাটিতে পা দিলেই ঢালুর দিকে হড়কে যাচ্ছিল পা। কোন চলাচলের রাস্তা ছিল না ওখানে। এই

বালি ও মাটিই প্রমাণ করছে, শত শত বছর ধরে কোন পা পড়েনি এখানে।

আগে আগে চলছে মার্ক লী, সঙ্গীরা তার পিছনে। হঠাৎ প্রাণ ছ্যাৎ করে উঠল মার্ক লীর। সে কথা বলতে চাইল, কিন্তু কন্ঠনালী স্তব্ধ হয়ে গেছে তার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, পা দুটো যেন মাটির সাথে গেঁথে গেছে।

সঙ্গীরাও থমকে দাঁড়াল। মার্ক লী কেন দাঁড়িয়েছে বুঝার চেষ্টা করছে তারা। মার্ক লী যেদিকে অবাক করা চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকে তাকাল তারা। দেখল, সামনে, এখান থেকে সোজা নিচের দিকে পাহাড়েরই একটা অংশের ওপাশে একটা মন্দির দাঁড়িয়ে আছে।

মার্ক লী বলল, 'ওটা কি কোন মন্দিরের চূড়া?'

'চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত একটা মন্দির দেখেও আপনি জিজ্ঞেস করছেন!' সঙ্গীদের চোখে অজানা আশার ঝিলিক খেলে গেল।

ওরা পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে পা টিপে টিপে চলছিল। বাম দিকে বহু দূর খাঁড়া নেমে গেছে পাহাড়ের শক্ত দেয়াল। ওদিকে তাকালে মাথা চক্কর দিয়ে উঠে। অনেক নিচে দেখা যায় এবড়ো থেবড়ো বালি ও পাথরের স্তুপ। পা পিছলে কোন রকমে সেখানে একবার গড়িয়ে পড়লে হাড়গোড় ছাতু হয়ে যাবে। তাই খাদের উল্টো দিক দিয়ে পা টিপে টিপে এগুচ্ছিল ওরা।

রাস্তাটা ভয়ানক দুর্গম। বিপদজনকভাবে সরু ও খাড়াভাবে নেমে গেছে বেশ কিছুটা পথ। মার্ক লীর সঙ্গীদের বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। একজন তো তাকে জিজ্ঞেসই করে

বসলো, 'আপনি কি মনে করেন, ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের লাশ এই বিপদসংকুল পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

'আহমদ দারবীশের নকশা তো তাই বলে।' মার্ক লী বললো, 'যে পর্যন্ত আমি নকশা বুঝতে পেরেছি তাতে যাওয়ার রাস্তা এটিই। রিম্যান্সের লাশের বাক্সটি হয়তো অন্য কোন পথে নেয়া হয়েছে। হয়তো পাহাড়ের খাঁজের ভেতর কোন সুড়ঙ্গ পথ থাকতে পারে। সে সব গোপন পথের সন্ধান পরে করবো। আগে নকশার নির্দেশ মত কত দূর যাওয়া যায় দেখতে চাই।'

'এ ধরনের অভিযানে গোপন পথই সাধারণত অভিযাত্রীকে তার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে কেউ গুপ্তধন বয়ে বেড়ায় না।' এক সঙ্গী তার মতামত ব্যক্ত করল।

'আমারও মনে হয় যে, গোপন রাস্তা দিয়েই সম্রাটের লাশ বহন করা হয়েছে। আমাদের তা খুঁজে পেতে হবে। তাহলেই কেবল তার কবর পর্যন্ত যাওয়ার আশা করতে পারি আমরা।'

'তোমাদের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি না। তবে মনে রাখতে হবে, শত শত বছর ধরে প্রাকৃতিক ঝড়ঝঞ্ঝা এবং বাতাসের তোড়ে পৃথিবীর মানচিত্র অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এতকাল পর সে সব গোপন রাস্তা আদৌ আছে কি নেই, তাই তো আমরা জানি না! আমি তোমাদের নিয়ে অন্ধের মত মরুভূমিতে সুই খুঁজতে চাই না। তারচে নিশানা ধরে এগিয়ে দেখতে চাই এই সব নকশা আসলেও কোন কাজের কিনা? নকশা ঠিক থাকলে কবর পর্যন্ত আমরা পৌঁছেও যেতে পারি।' বলল মার্ক লী।

'যদি বেঁচে থাকি!' হতাশ কণ্ঠে বলল তার এক সঙ্গী।

'কোন সন্দেহ নেই।' মার্ক লী বললো, 'তবে কবর খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকলে আমাদের আর কোন অভাব থাকবে না।'

একটা পাথরের সাথে রশি বেঁধে, রশি ধরে ঝুলে তারা অনেক কষ্টে সেই বিপদজনক পথটুকু পার হয়ে এল।

আস্তে আস্তে রাস্তার প্রশস্ততা ও গভীরতা বাড়তে লাগল। কিছু দূর নিচে নামার পর রাস্তা আবার ওপর দিকে উঠতে শুরু করল।

এখন তারা পাহাড়ের এমন জায়গা পাড়ি দিচ্ছিল, যেখানে দু'টি পাহাড় একত্রে মিশে চূড়ার দিকে এগিয়ে গেছে এবং সেখান থেকে আবার শুরু হয়েছে বিপদজনক ঢাল। মার্ক লী সেখানে পৌছে ঢাল বেয়ে সোজা নিচে না নেমে বাম দিকের পাহাড়ে আরোহণ করতে লাগলো।

প্রায় একশো গজের মত উপরে উঠার পর তাদের সামনে একটি সুড়ঙ্গ পথ চোখে পড়লো। মার্ক লী সঙ্গীদের নিয়ে সেই সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে পড়ল। পথটি ক্রমশ: নিচের দিকে চলে গেছে।

সুড়ঙ্গ পথে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল ওরা। তারপর সহসাই সুড়ঙ্গ শেষ গেল এবং তারা ছোট একটুখানি ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল।

ফাঁকা জায়গায় এসেই তারা সামনে তাকিয়ে দেখতে পেল, দূর দূরান্ত পর্যন্ত পাহাড়ের অসংখ্য ছোট বড় স্তম্ভ আকাশের দিকে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভগুলো নিরেট পাথরের এবং পরস্পর গায়ের সাথে লাগানো। প্রতিটি স্তম্ভ থেকেই অসংখ্য চোখা মাথা বেরিয়ে আছে। দৃশ্যটা খুবই

ভীতিজনক। এসব স্তম্ভ না মাড়িয়ে সামনে এগুনোর আর কোন পথ নেই। অথচ তা মাড়াতে গেলে হাত-পা জখম হওয়ার আশংকা ষোল আনা।

খুবই সতর্কতার সাথে কঠিন পাথরের ফাঁক গলে ওরা ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগলো। কয়েকবার বাঁক ঘুরে ডানদিকে আবার একটু খোলা জায়গা পেল ওরা। জায়গাটুকু গোলাকার একটা মঞ্চের মত। এখানকার আবহাওয়াই শুধু নয়, পায়ের নিচের মাটিও অসম্ভব গরম বোধ হলো। আশপাশের পাহাড়গুলোতে শেষ বিকেলের রোদ চমকাচ্ছে।

মার্ক লী অনুভব করলো, এখানকার মাটিতে এমন কোন ধাতু মিশ্রিত আছে যে কারণে এলাকাটা উত্তপ্ত হয়ে আছে। গোল মঞ্চসদৃশ এই উপত্যকার চারদিকই পাহাড় ঘেরা। এক পাশে কয়েক গজ লম্বা একটি ফোঁকড়। ওরা সেই ফোঁকড়ের কাছে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তিনজনই পিছনে সরে এল। ওরা দেখল, ফোঁকড়ের মুখ পর্যন্ত অনেক গভীর ও বিশাল এক খাদ। খাদের তলদেশে উত্তপ্ত বালুকা রাশি চমকাচ্ছে এবং সেখান থেকে এঁকেবেঁকে কম্পমান ধোঁয়া উঠে আসছে উপর দিকে। ইটের ভাটায় আগুন জ্বালাবার সময় যে কাল ধোঁয়া বেরোয় এর ধোঁয়া তেমন কাল নয়, বরং ডায়িং ফ্যাক্টরীর বাষ্পের মত শাদা।

এই গভীর খাদের মাঝখানে একটি প্রাকৃতিক দেয়াল। দেয়ালটি চওড়ায় মাত্র এক গজ, নিচে উপরে সমান চওড়া। যদি মার্ক লীদের ওপারে যেতেই হয় তবে এ প্রাচীর পার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দু'পাশের পাহাড়চূড়া এত উঁচু যে তা টপকানোর প্রশ্নই উঠে না।

মার্ক লীর মনে হল, সে এখন পুলসিরাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই পথটুকু পার হতে পারলেই সামনে বেহেশত। বেহেশতে তাকে যেতেই হবে এবং পঞ্চাশ গজের মত দীর্ঘ এই দেয়ালও পার হতে হবে তাকে।

মার্ক লীর এক সাথী বললো, 'এই দেয়ালের ওপর দিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমাকে আত্মহত্যার অন্য কোন উপায় বলে দিন।'

'গুপ্তধনের ভান্ডার রাজপথে পড়ে থাকে না!' মার্ক লী বললো, 'আমাদের এ রাস্তা পার হতেই হবে।'

'কিন্তু টুপ করে নিচের জাহান্নামে গিয়ে পড়লে ওই গুপ্তধন খাবে কে?' অপর সঙ্গী বললো।

'আমরা কি পবিত্র ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করিনি, ইসলামের ধ্বংস সাধনের জন্য আমরা এ জীবন উৎসর্গ করবো?' মার্ক লী বললো, 'যুদ্ধের ময়দানে কি আমাদের সঙ্গীরা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে না?'

'লড়াইয়ের ময়দানে জান দেয়া আর বেহুদা আগুনে ঝাপ দেয়া এক কথা নয়। আমরা ইচ্ছে করলেই এখান থেকে ফিরে গিয়ে আহমদ দারবীশকে বলতে পারবো, শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন আর নকশার রাস্তা খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় নেই। সে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। যেখানে নদী ছিল সেখানে ধূ ধূ বালি ও পাহাড়ী প্রান্তর। আর নক্সার যেখানে পাহাড়ী উপত্যকা দেখানো হয়েছে সেখানে এখন কিছুই নেই।'

'কিন্তু আমি কাপুরুষ হতে পারবো না। মিথ্যা কথাও বলতে পারবো না। এই দেয়াল আমার মনেও ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমি সে ভয় তাড়িয়ে দিয়েছি। তোমরাও ভয় ডর মুছে

ফেলো মন থেকে। এ প্রাচীর বেয়ে আমি ওপারে যাবোই। আমাকে সঙ্গ না দিলে তোমরা ক্রুশের কাছে প্রতারক বলে সাব্যস্ত হবে আর প্রতারকদের শাস্তি খুব বেদনাদায়ক হয়। আমি আগে আগে যাচ্ছি, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। মাথা চক্কর দিলে বা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে বসে পড়ে আত্মরক্ষা করবে। এমনভাবে বসে যাবে, যেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছো। সাহস ফিরে এলেই আবার এগুতে থাকবে।'

০

সহসা সেই গরম বাতাস জোরে বইতে শুরু করল। বালি উড়তে লাগলো। সেই সাথে খাদের ভেতর থেকে ভেসে এল মেয়েদের কান্নার স্বর। যেন দু'তিনজন নারী এক সাথে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

মার্কলী ও তার সঙ্গীরা কান খাড়া করে শুনতে লাগলো সে কান্নার ধ্বনি। কান্না শুরু হয়েছিল মিহি সুরে বিলাপের মত, এখন তার পরিবর্তে ভেসে আসতে লাগল বিকট আওয়াজ। মার্কলী ও তার সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গেল।

'এই জাহান্নামে কোন মানুষই বেঁচে থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই এসব প্রেতাত্মার কাণ্ড!' ভয়ে ভয়ে বলল এক সঙ্গী।

'না, এ কোন মানুষের কান্না নয়।' মার্কলী বললো, 'কোন প্রেতাত্মা বা কোন জীবিত প্রাণীর স্বরও নয়! এটা বাতাসের খেলা। বাতাস জোরে বইতে শুরু করায় কোথাও আঘাত খেয়ে এ সুরের সৃষ্টি হয়েছে। বাঁশিতে যেমন বাঁশরিয়া ফুঁ দিয়ে সুর তোলে, তেমনি কোথাও এমন কোন ছিদ্র বা সুড়ং আছে যাতে বাতাস ঢুকে এ রকম সুর ও আওয়াজ তুলছে। বাতাস যত জোরে বইবে সুর তত বিকট হবে। এতে ভয় পাবার কিছু

নেই।'

মার্ক লীর কথাই সত্যি, এ অঞ্চলের বিভিন্ন টিলার মধ্যে লম্বা লম্বা সুড়ং ছিল। বাতাস সে সুড়ংগুলোর এক দিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতো। যখন এ বাতাস তেছরাভাবে বইতো তখনি এ ধরনের ধ্বনি শোনা যেতো। দমকা বাতাস প্রবল বেগে বইতে শুরু করলে মনে হতো প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করছে একদল ডাইনী।

নিচে গভীর ও বিস্তৃত খাদ। চারপাশে ভয়ালদর্শন উলঙ্গ পাহাড় আর বাতাসে ভেসে বেড়ানো কান্নার আওয়াজ যে কাউকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মার্ক লীকে তা ভীত সন্ত্রস্ত করতে ব্যর্থ হলো।

কিন্তু তার সাথীদের উপর ভীতি এমন প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করল যে, মার্ক লীর এত কথার পরও তাদের মন থেকে সে ভয় দূর হলো না। তারা এই আওয়াজকে বাতাসের কারসাজি বলে মানতে পারছিল না। তাদের মনে হচ্ছিল, পাশেই কোথাও নারী ও প্রেতাত্মারা ক্রন্দন করছে। যে কান্নার ধ্বনি তারা নিজ কানে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। মার্ক লীর যুক্তিতর্ক এ সত্যকে আড়াল করতে পারছে না।

বাতাস প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল কান্নার কোরাস। বাতাসের তোড়ে উড়ে আসা ধুলোবালির ঝাপটা লাগছিল ওদের চোখে মুখে। সেই সাথে ছিল স্নায়ুতন্ত্রে আঘাতকারী কুয়াশা রঙের ধোঁয়া। জমিন থেকে উড়ে আসা হাল্কা ধূলোবালির মেঘ আর ধোঁয়ার কারণে বেশী দূর দৃষ্টি যাচ্ছিল না। মার্ক লী ও তার সঙ্গীরা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ওভাবেই ওখানে দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করার পরও মার্ক লী যখন দেখল দুর্যোগ মোটেই কমছে না তখন সে সঙ্গীদের বলল, 'এখানে বেশীক্ষণ থাকলে তোমরা পাগল হয়ে যাবে। এর থেকে নিস্তার পেতে চাইলে ওপারে চলো।'

এই দুর্যোগের মধ্যেই মার্ক লী দেয়ালের উপর প্রথম পা রাখল। দুর্যোগের ফলে একটা সুবিধা হলো তার, ভয়াবহ খাদের নিচ পর্যন্ত দৃষ্টি গেলে মাথায় যে চক্কর দিত তার হাত থেকে বেঁচে গেল সে।

মার্ক লী পা দিয়েই বুঝল, দেয়ালটি খুবই কাঁচা এবং দুর্বল। প্রাচীরের বালি ও মাটির মধ্যে পা দেবে গেলো তার। কিন্তু তাতে তার সংকল্পে কোন বিঘ্ন ঘটলো না। সে তার দ্বিতীয় পা'টিও তুলে আনলো প্রাচীরের ওপর। নিজের অজান্তেই নিচের দিকে দৃষ্টি চলে গেল তার। খাদের গভীরতার কথা মনে হতেই আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো সর্ব শরীর। কিন্তু তলদেশ চোখে না পড়ায় ভয়কে সে তাড়িয়ে দিতে পারলো।

মার্ক লী কয়েক কদম এগিয়ে গেল। ক্রন্দনের আওয়াজ আরও বেড়ে গেল মনে হয়। এখন তার পায়ের নিচে ভঙ্গুর দেয়াল, দুই পাশে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন গভীর খাদ। ডানে-বায়ে ধরার মত কোন কিছু নেই। প্রবল বাতাসের ঝাপটা লাগছে মার্ক লীর গায়ে। দমকা হাওয়ার ধাক্কায় একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে শরীর। দেহের ওজন মনে হচ্ছে কমে যাচ্ছে।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে সাথীদের বললো, 'ভয় নেই, সাহস করে পা রাখো, দেখবে আমার মতই চলতে পারছো। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে অগ্রসর হও! নিচের দিকে মোটেই তাকাবে না। মনে মনে কল্পনা করো, তোমরা মাটির উপর দিয়ে স্বাভাবিক

ভাবে হেঁটে চলছো।'

সঙ্গী দু'জন অসহায়ভাবে একে অন্যের দিকে তাকাল। মার্ক লীকে ছাড়া একাকী ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভয় হচ্ছিল ওদের, আবার মার্ক লীর মত দেয়াল পাড়ি দিতেও ওদের বুক দুরুদুরু করে কাঁপছিল।

মার্ক লীর তাগাদা পেয়ে একজন অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেয়ালের উপরে পা তুলে দিল। তার দেখাদেখি অন্যজনও উঠে এল প্রাচীরের ওপর। কয়েক কদম এগুনোর পর যখন সে বুঝতে পারল দেয়ালের ওপর উঠে এসেছে তখনই একজনের গা কাঁপুনি শুরু হল। কাঁপতে কাঁপতেই কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে গেল লোকটি। তারপর দুলতে দুলতে যখন মনে হলো সে পড়ে যাচ্ছে, দেয়ালের ওপর বসে পড়ে আঁকড়ে ধরল দেয়াল।

সঙ্গীর অবস্থা দেখে অন্যজনের মনেও এ ভয় সংক্রামিত হল, সাথে সাথে কাঁপতে কাঁপতে সেও বসে পড়ল প্রাচীরের ওপর। অবস্থাটা এখন আরো নাজুক হয়ে উঠল। সামনে এখনো অনেক পথ বাকী, পেছনে ফিরে যাবে সে উপায়ও নেই, কারণ দেয়াল এতই সংকীর্ণ যে এখানে ঘুরে বসার ঝুঁকিও নিতে পারছে না। উপায়ান্তর না পেয়ে সঙ্গী দু'জন স্থবির হয়ে মরার মত পড়ে রইল দেয়ালের ওপর।

মার্ক লী তাদের মনোবল বাড়াতে চাইল। বলল, 'ঠিক আছে, তোমাদের আর উঠে দাঁড়াবার দরকার নেই। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসো।'

ওরা সম্মোহিতের মত মার্ক লীর হুকুম তামিল করল।

প্রায় অর্ধেক পথ এগিয়ে এসেছে ওরা। মাঝামাঝি পৌছে

মার্ক লী দেখলো, মাঝখানে দেয়াল একটু ভাঙ্গা ও নিচের দিকে ঢালু হয়ে গেছে। সেখানে চওড়া এত কম যে, দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না। এবার মার্ক লীও বসে পড়লো।

সঙ্গীরা বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল, সে তাদের মত বসলো না। ঘোড়ার আরোহীরা যেভাবে দুই ঠ্যাং দুই দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে সেভাবে দেয়ালের দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসলো সে। দেয়ালের চওড়া ক্রমশ কমে আসছিল। মার্ক লী দু'হাত দু'দিকে দিয়ে লেংড়া মানুষের মত ঘষটে ঘষটে আস্তে করে নিচে নেমে গেল এবং ভাঙা অংশটুকু পার হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাকে অনুসরণ করে তার এক সাথীও পার হয়ে এল ভাঙা অংশ। কিন্তু তৃতীয়জন ভাঙা জায়গায় নামতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে গেল। তাল সামলাতে গিয়ে পাশ থেকে ছুটে গেল তার হাত। ভয় ও আতংকে আর্ত চিৎকার করে উঠল লোকটি, 'মার্ক লী আমাকে ধরো।'

কিন্তু তার কাছে এগিয়ে যাওয়ার সময় পেল না কেউ। তার আগেই সে একদিকে ছিটকে পড়ল। 'বাঁচাও' বলে বুক ফাঁটা একটা আর্ত চিৎকার শুধু শুনতে পেল ওরা, কিন্তু তাকে আর দেখতে পেল না। সেই চিৎকারের শব্দ আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে গেল এবং ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল।

তারা তার পতনের শব্দ শোনার জন্য কান পেতে রইল, কিন্তু তেমন কোন শব্দ শুনতে পেল না। বাতাসে ভেসে বেড়ানো নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকারের নিচে চাপা পড়ে গেল তার পতনের শব্দ। মার্ক লী নিচে তাকালো, কিছুই দেখা গেল না।

সঙ্গীর মরণ চিৎকার তখনও কানে বাজছিল ওদের, আতংক গ্রাস করে ফেলেছিল ওদের চিন্তা চেতনা। পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোয় মার্ক লী ও তার সঙ্গীটি সেই ভয়ানক খাদের মধ্যে সংকীর্ণ ভঙ্গুর দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে বোবা চোখে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি আমাকে সাথে সাথে রেখো মার্ক লী।' তার এখনকার একমাত্র সঙ্গীটি বলল, 'আমি এমন মৃত্যু চাই না।' ভয়ে তার গলা কাঁপছিল।

তার মনোবল বাড়ানো ছাড়া মার্ক লীর আর কিছুই করার ছিল না। সে বলল, 'সামনে আর কোন বিপদজনক ভাঙা চোখে পড়ছে না। মনে হয় বাকী পথ নিরাপদেই যেতে পারবো।'

মার্ক লী আবার এগিয়ে যেতে শুরু করলো। তার প্রায় গা ঘেষে চলল তার সঙ্গী। দমকা বাতাসের বেগ আগের চেয়েও তীব্র আকার ধারণ করল। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে পথ চলা কঠিন হয়ে দাঁড়াল ওদের পক্ষে। বাধ্য হয়ে আবার বসে পড়ল মার্ক লী। দু'জন ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো।

এখানে দেয়াল আরেকটু চওড়া। মার্ক লী উঠে দাঁড়াল এবং ঘুরে সঙ্গীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। দেয়াল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রাণে আশার আলো জ্বলে উঠল ওদের। দুই টিলার মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ একটি রাস্তার মুখে শেষ হয়েছে দেয়াল। ওরা দু'জন সেই সংকীর্ণ রাস্তায় প্রবেশ করলো।

মার্ক লীর সঙ্গী বললো, 'জেফ্রে হয়ত মরে গেছে। তার পরিণতির কথা ও অন্তিম চিৎকার আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না।'

মার্ক লী তার দিকে তাকালো, দেখল, তার চোখে অশ্রু

টলমল করছে। কিছু না বলে সে সঙ্গীর কাঁধে হাত রাখল এবং তাকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলো।

সংকীর্ণ পথ আস্তে আস্তে চওড়া হতে লাগলো। মার্ক লী তার সাথীকে বললো, 'আমাদেব ভাগ্য ভাল, যে দিকেই যাই একটাই রাস্তা সামনে পড়ে। একাধিক রাস্তা হলে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতাম।'

এক সময় গলিপথ শেষ হয়ে এল। প্রশস্ত হতে হতে একেবারে মুক্ত ময়দানে এসে পড়ল ওরা। ময়দান পার হয়ে পাহাড়ের ঢালে উঠে এল। ঢালটি ক্রমশ উপর দিকে উঠে গেছে। বাতাস তখনও বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল।

এই ভয়াবহ এলাকার কতটুকু গভীরে ওরা চলে এসেছে এ নিয়ে মার্ক লীর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সে জানতো, দুনিয়ার লোকসমাজ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অসম্ভব জেনেও সে এ পথে পা বাড়িয়েছে। হয়তো তার সামনে আরো অসংখ্য বিপদ ওঁৎ পেতে আছে। তবু এর শেষ কোথায় সে দেখতে চায়।

জাতির প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই এ বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছে সে। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয়, ফেরাউনের এ গুপ্তধন প্রয়োজন তার জাতির জন্য। এখান থেকে উদ্ধারকৃত মহামূল্য সম্পদ সে ব্যবহার করবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে করে দেবে এ ধনরত্ন। ধূলায় মিশিয়ে দেবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর স্বপ্নসাধ। বিশ্বব্যাপী কায়েম হবে খৃস্টান সাম্রাজ্য। এ উদ্দেশ্যেই সে এই অভিযানে বেরিয়েছে।

সে তার ভীতসন্ত্রস্ত সঙ্গীকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে

লাগলো। সামনের দিক থেকে বাতাস আসছিল। পাহাড়টি আগেরগুলোর মত কন্টকাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল ছিল না। এর চড়াইগুলোও ছিল সহনীয়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় উঠে এল। উপরের দিকে তাকাল মার্ক লী। নির্মেঘ আকাশ দেখা যাচ্ছে। সে একটু দাঁড়াল। লম্বা করে শ্বাস টেনে বাতাসের গন্ধ নিল। বললো, 'শুঁকে দেখো, বাতাসে এখন আর মরুভূমির রুক্ষতার গন্ধ নেই।'

'তোমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' তার সাথী বললো, 'মরুভূমিতে মরুভূমির গন্ধ থাকবে না তো কিসের গন্ধ থাকবে? তুমি কি বাতাসে এখন ঝর্ণা, সবুজ ঘাস ও সোঁদা মাটির গন্ধ পাচ্ছো?'

মার্ক লী চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস টেনে গভীর মনযোগের সাথে বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছিল আর বলছিল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, এ রকম উষর মরুভূমিতে পানির আশা করা যায় না। আমি হয়ত আন্দাজেই খেজুরের বাগান, সবুজ ঘাস ও পানির ঘ্রাণ নিচ্ছি। হয়তো আমার ঘ্রাণ নেয়ার অনুভূতি আমাকে ধোকা দিচ্ছে। নইলে এই জাহান্নামে পানির ঘ্রাণ আমি পাবো কেন! কিন্তু আমার ঘ্রাণশক্তি প্রবল এবং এই ঘ্রাণ আমার পরীক্ষিত!'

'মার্ক লী!' সাথী তার হাত টেনে ধরে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, 'আমিও একটি ঘ্রাণ পাচ্ছি, সেটি মৃত্যুর ঘ্রাণ। আমার কেবলি মনে হচ্ছে, মৃত্যু দ্রুত এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এসো বন্ধু, আমরা যেদিক দিয়ে এসেছি, আবার সে পথে ফিরে যাই। যদি তুমি আমাকে ভীরু ও কাপুরুষ ভেবে থাকো, তবে

আমাকে যুদ্ধের মাঠে পাঠিয়ে দাও। দেখবে, মরার আগে আমি অন্তত একশ মুসলমানকে হত্যা করেছি।'

মার্ক লী সঙ্গীর মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছিল। এ অবস্থায় তাকে কিছু বলা সমীচিন মনে করল না। সে সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে একটু হেসে বললো, 'অতো ভয় পাচ্ছো কেন? জানো না, ভীরুরাই আগে মরে! জেফ্রে যদি অতো ভয় না পেতো, তবে মরতো না। যত বেশী সাহসী হবে ততই বাঁচার সম্ভাবনা বাড়বে। পৃথিবীতে যখন এসেছি মরতে আমাদের হবেই। মরার আগে এসো কিছু বড় কাজ করে যাই। যদি কোনদিন ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যাসের কবর আবিষ্কৃত হয়, আমাদের ওরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। আমি একশ নয়, এক হাজার মুসলমান কাটবো কিন্তু মরব না। আমার সাথে আসো।'

সে সঙ্গীকে নিয়ে আবার পাহাড়ের গা বয়ে উঠতে লাগলো। পাহাড়ের চূড়া বেশী উঁচুতে ছিল না। ক্লান্ত পায়ে সেই চূড়ার দিকে এগিয়ে চলল ওরা। উঠতে উঠতে এক সময় চূড়ায় পৌঁছে গেল।

বালিতে তাদের চোখ মুখ একাকার হয়ে গিয়েছিল। মার্ক লী চোখ মুখ মুছে টিলার উপর বসে পড়লো। সঙ্গীও বসলো তার পাশে।

মার্ক লী বললো, 'তোমার যদি মরুভূমি সম্পর্কে ভাল রকম অভিজ্ঞতা থাকে তবে সামনে মরীচিকা আছে কিনা বুঝতে পারবে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখো, বলো এটা কি মরীচিকা?'

সঙ্গী সামনের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে দেখলো। তারপর

সে চোখ বন্ধ করলো এবং আবার খুললো। এবারও গভীর ভাবে লক্ষ্য করে বললো; 'না, এটাকে মরীচিকা মনে হচ্ছে না।'

সত্যি এটা কোন মরীচিকা ছিল না। তাদের চোখের সামনে ছিল খেজুরের কয়েকটি বাগান। গাছের পাতাগুলো সবুজ ছিল। গাছগুলো ছিল নিম্নাঞ্চলে এবং বেশ দূরে।

মার্ক লী উঠে দাঁড়াল। সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল তার সঙ্গীও। সবুজ উদ্যান দেখার সাথে সাথে ক্লান্তি ও ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল ওদের।

হাঁটিতে গিয়ে পায়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওরা তখন দৌড়াতে শুরু করেছে। আগে আগে দৌড়াচ্ছে মার্ক লী, পেছনে তার সাথী। তাদের চলার পথে অদ্ভূত দর্শন টিলা পড়ছিল। কোনটা বড় আবার কোনটা ছোট। কোনটা এমন যেন কোন লোক হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। মার্ক লী এ সবের মধ্য দিয়ে রাস্তা খুঁজে দৌড়াচ্ছে।

সূর্য প্রায় ডুবতে বসেছে। মার্ক লীর শ্বাস-প্রশ্বাস জোরে বইছিল, বুক উঠানামা করছিল তার। সঙ্গীর অবস্থাও সঙ্গীন। পা টেনে টেনে চলছিল সে। মার্ক লী আচমকা থমকে দাঁড়াল এবং সন্তর্পনে ধীরে ধীরে পিছনে সরে আসতে লাগলো। বুঝা যায়, কোন কিছু দেখে সে ভয় পেয়েছে। তার সাথী থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

০

এখান থেকে হঠাৎ করেই একটি নিম্নাঞ্চল শুরু হয়েছে। কম করেও এক মাইল বিস্তৃত। তার চারপাশে মাটি ও বালির প্রাকৃতিক দেয়াল। অঞ্চলটি গভীর এবং শস্য শ্যামলে পরিপূর্ণ।

সেখানে খেজুরের ছোট বড় অনেক গাছ। স্পষ্টই বুঝা যায়, সেখানে অনেক পানি আছে। এমন কঠিন জাহান্নামে এমন শস্য শ্যামল প্রান্তর কল্পনার অতীত। অভিভূত হয়ে দু'জনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই প্রান্তরের দিকে।

এই সেই প্রান্তর, একটু আগে পাহাড় চূড়া থেকে ওরা যা দেখেছিল এবং যার ঘ্রাণ পেয়েছিল মার্ক লী। এ এক অদ্ভুত এলাকা। একটু আগে ছিল নিরেট পাথুরে পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চল, হঠাৎ করেই সে দুর্ভেদ্য পাহাড়শ্রেণী শেষ হয়ে গেল। এরপর দেখা গেল মাটি ও বালি মিশ্রিত উপত্যকা, যেখানে হাটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে অসংখ্য পাথরের মূর্তি।

হঠাৎ করেই আবার এ অঞ্চল শেষ হয়ে শুরু হয়েছে শস্য শ্যামল সবুজ প্রান্তর। অথচ এক জায়গা থেকে আরেক অঞ্চলের সামান্য আঁচও পাওয়া যায় না, সামান্য কল্পনায়ও আসে না।

মার্ক লী ভয় পেয়েছিল অন্য কারণে। কয়েক কদম পিছিয়ে সে দ্রুত বসে পড়েছিল এবং তার সাথীকেও হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়েছিল। তার চোখের সামনে ধরা পড়েছিল একটি আশ্চর্য দৃশ্য।

ওখানে দু'জন মানুষকে সে এদিকেই হেঁটে আসতে দেখল। লোক দু'জন সম্পূর্ণ উলঙ্গ এবং তাদের গায়ের রং ছিল ঘন বাদামী। তাদের শারীরিক গঠন বেশ সুঠাম ও বলিষ্ঠ।

মার্ক লী তাকিয়ে থাকল সেই উদ্যানের দিকে। দেখতে পেল, একজন মেয়ে মানুষ খেজুর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের ভেতর দিয়ে আরেক দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভেনাসের মূর্তির মত সেও ছিল আপাদমস্তক নগ্ন।

তার মাথার চুল কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। চেহারা সুরতে এদের হাবশী বা জঙ্গলী মনে হচ্ছিল না।

'এরা সব প্রেতাত্মার দল!' মার্ক লীর সাথী বললো, 'এরা কখনও মানুষ হতে পারে না! মার্ক লী, সূর্য ডুবে যাচ্ছে, উঠো, এখনো সময় আছে, চলো আমরা পিছনে পালিয়ে যাই। রাতে এরা আমাদেরকে জীবিত রাখবে না।'

মার্ক লী এদের প্রেতাত্মা ভাবতে পারছিল না। সে বলল, 'এরা প্রেতাত্মা নয়, আমার মনে হয় এরাও মানুষ।'

কিন্তু তার কণ্ঠে তেমন জোর ছিল না। সে তখন ভাবছিল, এরা আবার কোন জাতি! এরা তো বাতাসে উড়ছে না, মানুষের মত মাটিতেই হাঁটছে!

কৌতুহলের বশে ওরা আবার উঁকি দিল সবুজ প্রান্তরে। দেখল, দূরে তিনটি শিশু একে অন্যের সাথে দৌড়াদৌড়ি খেলছে। একেবারেই মানব শিশুর মত অবয়ব ও কার্যকলাপ ওদের।

মার্ক লী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল প্রান্তরের কিনারা পর্যন্ত। গিয়েই শুয়ে পড়লো। তার সাথীও তার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারা যেখানে শুয়ে দেখছিল, সেখানকার দেয়াল তেমন খাড়া ছিল না। কিছুটা ঢালু হয়ে তা সবুজ প্রান্তরের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং তা ছিল বালি ভর্তি।

মার্ক লীর সাথী আরও একটু অগ্রসর হয়ে ঝুঁকে নিচে দেখার চেষ্টা করলো। হঠাৎ বালি নিচের দিকে গড়িয়ে গেল এবং সে কিছু বুঝে উঠার আগেই সেই বালির সাথে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে গিয়ে পৌঁছলো।

সে সেখান থেকে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু

যতবার সে বালিতে পা রাখে ততবারই সেখানকার বালি হড়কে যায় এবং সে আবারো গড়িয়ে পড়ে।

আতঙ্কে সে যেন পাগল হয়ে গেল, সে এখানে ওখানে পাগলের মত বালি খামচাতে লাগল। তার হাত পা অসাড় ও অবশ হয়ে হয়ে পড়ল। অবশেষে নেতিয়ে পড়ে হাল ছেড়ে দিয়ে সেই বালির ওপরই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল সে।

মার্ক লী সঙ্গীকে পড়ে যেতে দেখেই জলদি পিছনে সরে গিয়ে একটি টিবির আড়ালে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে সে নিচে সবই দেখতে পাচ্ছিল।

তার সাথী খৃস্টান লোকটি গড়িয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজ নিচে পড়ে গিয়েছিল। মার্ক লী তার সাথীকে উঠতে দেখলো এবং উপরে উঠার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা অবলোকন করলো। কিন্তু মার্ক লী তাকে কোন সাহায্যই করতে পারল না।

দু'জন উলঙ্গ লোক এদিকে আসছিল। তারা বালিতে মুখ থুবড়ে একটি লোককে পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে সেখানে ছুটে এলো। মার্ক লী উপর থেকে তাদের দেখতে লাগলো।

তার সাথী তাকে দেখতে পাচ্ছিল না, মার্ক লীও ডেকে তাকে সতর্ক করতে পারছিল না। কারণ, সে চাচ্ছিল না, এখানে আরও কেউ আছে জেনে যাক ওই লোকগুলো।

লোক দু'জন এসে মার্ক লীর সাথীকে পিছন থেকে চেপে ধরলো।

তার কাছে খঞ্জর ও একটি ছোট তলোয়ার ছিল। কিন্তু অস্ত্র বের করার সুযোগ সে পেল না। ঐ দুই লোক তাকে নিচে শুইয়ে দিল। সেই মহিলা, যাকে সে একটু আগে দেখেছিল এবং সেই শিশুরা, যাদের সে খেলতে দেখেছিল, দূর থেকে এ

দৃশ্য দেখতে পেয়ে তারাও সেখানে ছুটে এল।

তারা তাদের ভাষায় কাউকে ডাকলো। বাগান থেকে দশ বারোজন লোক ছুটে এল সে ডাক শুনে।

একজন মাটিতে পড়ে থাকা খৃস্টান লোকটির কোমর থেকে তলোয়ার বের করে নিল। আরেকজন তাকে শুইয়ে দিল।

মার্ক লী দেখলো, একজন তার সঙ্গীর ঘাড়ের শাহরগে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যেরা তাকে ঘিরে ধরে আনন্দে নাচছে। নৃত্যরত লোকগুলো তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে আর হাত তালি দিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইছে।

ইতিমধ্যে একজন বুড়োমত লোক এসে হাজির হলো। তার হাতে দেহ সমান লাঠি। তাকে দেখে সবাই একদিকে সরে গেল।

বৃদ্ধের লাঠির মাথায় ফনা তোলা দুইটি সাপের মাথা। ফেরাউনের প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ এই প্রতীক ব্যবহার করা হতো।

বৃদ্ধ মার্ক লীর সাথীর গায়ে হাত দিল। সে এখন আর ছটফট করছিল না। লোকটির পায়ের চাপে এরই মধ্যে সে মারা গিয়েছিল।

বৃদ্ধ এক হাত শূন্যে উঁচু করলো এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু বললো। নারী ও শিশুসহ উলঙ্গ মানুষগুলো সিজদায় পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ ওভাবেই পড়ে থাকল লোকগুলো। বৃদ্ধ আবার হাত উপরে তুলল এবং কিছু বলল. সকলেই সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালো।

মার্ক লীর সাথী যেদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল সে দিকে হাত

ইশারা করে একজন বৃদ্ধকে কিছু বলল। মার্ক লী অনুমান করল, লোকটি বলেছে, 'এই মানুষটি উপর থেকে এদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে।'

বৃদ্ধের আদেশে লোকেরা মার্ক লী সাথীর লাশটি উঠিয়ে নিয়ে গেল। মার্ক লীর ভয় হলো, এই বন্য লোকেরা ওর সাথীদের খুঁজতে না উপরে উঠে আসে!

সে কিছুক্ষণ ওখানেই বসে থেকে নিচের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলো।

সূর্য ডুবে গেল। নিঃসঙ্গ মার্ক লী ভাবছিল এখন কি করবে? বন্ধুর অসহায় মৃত্যুর কথা মনে হলো তার। লোকগুলো তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি, জানতে চায়নি কোত্থেকে কেন এসেছে সে? কিভাবে এসেছে? বরং ওকে হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়ার সাথে সাথে তাকে হত্যা করেছে। কোন বিচারের ধার ধারেনি, এমনকি সরদার আসার জন্যও অপেক্ষা করেনি। তার মানে ওদের হাতে ধরা পড়া মানেই মৃত্যু।

আবার ভাবছিল, কঠিন জেনেই এ অভিযানের দায়িত্ব কবুল করেছিল সে। এই রহস্যময় লোকগুলো কারা, এখানে ওরা কি করছে, ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কবরের সাথে ওদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, এই সব রহস্য উদঘাটন না করে ফিরে যাওয়া মানেই অভিযানের ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা সে মেনে নিতে পারে না। যে অভিযানে তার দুই সাথী প্রাণ দিয়েছে. সে অভিযানে হয় সে সফল হবে নয়তো বন্ধুদের মত সেও দেশ ও জাতির নামে প্রাণ বিসর্জন দেবে, কিন্তু কিছুতেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে না।

রাতের আঁধার গ্রাস করে ফেলেছিল পাহাড়, মরুভূমি,

উপত্যকা, প্রান্তর, সমস্ত চরাচর। নিশুতির নিরবতা নেমে এসেছিল উপত্যকার ঢালে, মার্ক লীর চতুর্পাশে। পেছনের বিকটদর্শন পাহাড়ের অবয়ব যেমন অদৃশ্য হয়েছিল সে আঁধারের কোলে, তেমনি খর্জুর বীথির সবুজ প্রান্তরের লোভাতুর দৃশ্যও উধাও হয়ে গেছে অনেক আগেই।

নিঃসঙ্গ মার্ক লী সাথীদের রক্তের কসম খেয়ে উঠে দাঁড়াল। তার এক হাতে খঞ্জর ও অন্য হাতে তলোয়ার। এদিকে ওদিক তাকিয়ে দেখলো সে। তারপর যাত্রা করল অসম্ভব এক অভিযানে, ভয়ংকর মৃত্যুর পথে।

মার্ক লী সেই পথে পা বাড়াল যে দিকে তারা তার সাথীকে নিয়ে গেছে। প্রথমে সে এক পা রাখল বালিয়াড়িতে, তারপর উবু হয়ে তলোয়ার ও খঞ্জর বালিতে গাঁথলো। এরপর দ্বিতীয় পা টেনে সামনে বাড়িয়ে তলোয়ার ও খঞ্জর তুলে এনে আবার সামনে গাঁথলো। এইভাবে তলোয়ার ও খঞ্জরে ভর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে অন্ধকারে পা টিপে টিপে সমতলে পৌঁছতে তার আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেল।

সবুজ প্রান্তরে নেমে এল মার্ক লী। সেখানে বিরাজ করছিল কবরের নিস্তব্ধ নিরবতা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চলছিল সে। ডানে-বামে ও পিছনে লক্ষ্য করছিল বারবার। কোথাও কোন শব্দ নেই। সেই সুনসান নিরবতার ভেতর দিয়ে পদে পদে মৃত্যুর ভয় নিয়ে এগুচ্ছিল সে। খেজুর বাগানের পাশ দিয়ে পথটি চলে গছে পশ্চিম দিকে।

মিনিট পনেরো এভাবে চলার পর দূর থেকে অস্পষ্ট গানের স্বর ভেসে এল তার কানে। আস্তে আস্তে সে শব্দ জোরালো হলো। এখন পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, কোথাও গানের আসর

বসেছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে নাচ-গানের সুমিষ্ট সুর।

সে ওই আওয়াজ লক্ষ্য করে খুব সাবধানে এগিয়ে গেল। একটু এগুতেই বাদিকে এক বিস্তৃত নিম্নভূমিতে সে দেখতে পেল কয়েকটি মশাল জ্বলছে। সেই মশালকে ঘিরে কম করেও বিশ-পঁচিশ জন নারী, পুরুষ ও শিশু বসে আছে। মশালের বৃত্তের ভেতর এক তরুনী নাচছে, বাকীরা তাকিয়ে তার নাচ দেখছে আর গান গাইছে। পাশেই আরেক জায়গায় অনেক কাঠখড় দিয়ে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে পোড়ানো হচ্ছে একটি মানুষের লাশ। লাশটির পা ও মাথা বেঁধে আগুনের ওপর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কয়েকজন তার পাশে দাঁড়িয়ে লাশটি এদিক ওদিক ঘুরাচ্ছে যাতে ঠিকমত ঝলসানো হয়। এই লাশটি ছিল মার্ক লীর সেই হতভাগ্য সাথীর।

মার্ক লী এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখছিল আর ভাবছিল নিজের পরিণতির কথা। মানুষ-পোড়া মাংশের গন্ধে ভুরভুর করছিল এলাকাটা। দুর্গন্ধে তার বমি আসার উপক্রম। সে দেখলো, একদল তরুনী সেখান থেকে মাংশ কেটে সকলকে পরিবেশন করা শুরু করল।

মার্ক লীর মনে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। তার কঠিন হৃদয়েও ফাটল ধরল। দুঃসাহসের পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ভীত চকিত হরিণীর মত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল তার সিংহ হৃদয়। তার অটল সংকল্প ও জাতিপ্রেম ভেসে গেল ভয়ের স্রোতে। সে আর এক মুহূর্তও সেখান দাঁড়াল না। সোজা ফিরে চলল যে পথে এসেছিল সেই পথে।

সে খুব সতর্ক হয়ে পথ চলছিল। সবুজ প্রান্তরের শেষ

সীমান্তে এসে পৌঁছে গেল সে। উপত্যকার সেই ঢালের নিচে সে এখন দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে পড়ে যাওয়ার পর তার সাথী খুন হয়েছিল। নামার সময় তলোয়ার ও খঞ্জরের সাহায্য নিয়ে অনেক কসরত করে নেমেছিল সে কিন্তু কি করে এবার উপরে উঠবে ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ সে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

দূর থেকে একাধিক পাহাড়ী জন্তুর চাপা গর্জনের শব্দ ভেসে এল। তার মনে পড়ে গেল খাদে পড়ে যাওয়া দুর্ভাগা সাথীর কথা। হয়তো মরুভূমির শৃগাল এখন তাকে খাচ্ছে। আর অন্য সাথীকে তো খাচ্ছে মানুষই। অভিযানে বেরিয়েছিল ওরা তিনজন। দু'জন চিরবিদায় নিয়েছে, এবার কি তার পালা? কোন দিক থেকে আসবে মৃত্যু? কখন আসবে? কেমন করে আসবে? ভয়ের সাথে হতাশা ও অস্থিরতা ঘিরে ধরল তাকে।

যেভাবে উপত্যকা থেকে নেমেছিল মার্ক লী, সেভাবেই- অতি সাবধানে উপরে উঠতে শুরু করল সে। রাতের শেষ প্রহরে সে ঐ জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো, যেখানে তাদের উট তিনটি বসেছিল। ওখানে সে এক মুহূর্তও দেরী করলো না। উটের গলায় বাধা পানি থেকে কয়েক ঢোক পান করে সে একটি উটের পিঠে উঠে বসলো। অন্য দু'টি উট তার সঙ্গে পিছনে পিছনে চললো।

০

পর দিন সন্ধ্যা। মার্ক লী এক সম্মানিত মিশরীয় বণিকের বেশে আহমদ দারবীশের গৃহে প্রবেশ করলো। আহমদ দারবীশ তাকে দেখেই প্রশ্ন করলো, 'তুমি একা যে? ওরা দু'জন কোথায়?'

মার্ক লী এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সে ক্লান্ত ও অসহায় ভঙ্গিতে আহমদ দারবীশের সামনে বসে পড়লো। তার জ্ঞান বুদ্ধি তখনও ঠিক মত কাজ করছিল না।

'কি ব্যাপার! তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?'

'আমাকে একটু গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ দিন। সব কথাই বলবো আপনাকে।'

মুখোমুখি বসলো দু'জন। গুছিয়ে নিয়ে কথা শুরু করল মার্ক লী। প্রতিটি ঘটনা ও কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলো। বর্ণনার সাথে সাথে আহমদ দারবীশের চেহারার রঙ পাল্টে যাচ্ছিল। মার্ক লীর এক সাথীর করুণ মৃত্যুর বিবরণ শুনে আফসোস করলেন তিনি। কিন্তু তাকে যখন শোনানো হলো দ্বিতীয় সাথীর মৃত্যুর কাহিনী এবং বলা হলো, 'তাকে একদল মানুষ খেকো উলঙ্গ লোক খেয়ে ফেলেছে', তখন আহমদ দারবীশ দু:খ করার পরিবর্তে খুশীতে নেচে উঠলো।

'তুমি কি সচক্ষে দেখেছো, তাদের কারো গায়ে কোন কাপড় ছিল না?'

'আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না।' পুলকিত চিত্তে বললেন আহমদ দারবীশ, 'তবু শুনতে চাচ্ছি, তুমি কি ভাল করে দেখেছো, বৃদ্ধের লাঠির উপর দুই ফনা তোলা সাপ? তুমি কি শিওর যে, সে লোকেরা তোমার সঙ্গীর গোস্ত খেয়েছে?'

'আলবৎ শিওর! আমি কোন স্বপ্নের বর্ণনা দিতে বসিনি আপনার সামনে।' মার্ক লী বিরক্ত হয়ে বললো, 'আমাদের ওপর দিয়ে যা ঘটে গেছে আমি শুধু তাই শুনাচ্ছি আপনাকে। আর আমি যা বলছি তা নিজ চোখে দেখেই বলছি।'

'ফেরাউনও এ কথাই বলে গেছে, যা তুমি বর্ণনা করেছো।' আহমদ দারবীশ উঠে মার্ক লীর কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'তুমি রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছো মার্ক লী! এই সেই লোক, যাদের আমরা অনুসন্ধান করছি। এই কবিলা সেখানে ষোলশ' বছর ধরে বাস করে আসছে। এই লোকেরা চিন্তাও করেনি যে, সময় তাদেরকে মানুষের মাংস খেতে বাধ্য করবে। তুমি নকশার যে লেখাগুলো উদ্ধার করতে পারোনি আমি তা করে ফেলেছি। এতে লেখা আছে, সাধারণত গুপ্তধনের রক্ষায় সাপের পাহারা বসানো হয়। কিন্তু আমার ধন ও কবরের হেফাজত করবে মানুষ। তাদের হাতে থাকবে ফনা তোলা সাপের আশা (লাঠি)। শত শত বছর পরে তারা নিজেরাই হিংস্র পশু ও সাপের স্বভাব পেয়ে যাবে।

আমার কবরের সীমানায় যারা আসবে তাদেরকে আমার রক্ষীরা খেয়ে ফেলবে। সভ্যতার সাথে এই রক্ষীদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। যুগ যুগ ধরে তারা এখানে উলঙ্গ জীবন যাপন করবে। বাইরের কোন লোক তাদের নারীদের ওপর কুদৃষ্টি দিতে পারবে না। যে দেবে সে এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারবে না।'

'আমি জীবিত ফিরে এসেছি।' বলল মার্ক লী।

'তুমি নিচে ওদের কাছে যাওনি এবং আমি নিশ্চিত, তুমি কারো দিকে কুনজরে তাকাওনি, তাই তুমি ওখান থেকে জীবিত ফিরে আসতে পেরেছো।' বললেন আহমদ দারবীশ। 'তুমি যে কালো রংয়ের পাথুরে পাহাড়ের কথা উল্লেখ করেছো সে পাহাড়ের কোন এক প্রান্তে ফেরাউন রিম্যান্সের আরক দেয়া

লাশ ও তার পূঞ্জিভূত গুপ্তধন লুকানো আছে। যুগ যুগ ধরে এই বিবস্ত্র মানুষেরা সে ধন পাহারা দিয়ে আসছে।'

'তার মানে ফেরাউন রিম্যাঙ্গের সময় থেকে তারা সেখানে বংশানুক্রমে পাহারা দিয়ে আসছে!' মার্ক লীর বিস্মিত কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, ষোল শ' বছর ধরে এ দায়িত্ব পালন করে আসছে তারা।'

'কিন্তু তারা আজো বেঁচে আছে কি করে?'

'জানিনা তারা কি করে বেঁচে আছে! মনে হয় হিংস্র পশুর মত মরুভূমির পাখি ও পশু শিকার করে খায় তারা। তাছাড়া তুমিই তো বললে, সেখানে পানি ও খেজুরের অভাব নেই। এই পানি ও খেজুর তাদের বাঁচিয়ে রাখলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।'

'কিন্তু এই দুর্গম অঞ্চল থেকে তারা সভ্য জগতে ফিরে আসে না কেন?'

'তারা আজও ফেরাউনকে খোদা মান্য করে। যদি তাদের বিশ্বাসে চিড় ধরতো তবে তারা অন্য কোথাও চলে যেতো। তুমি তাদের কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র দেখেছ?'

'না, দেখিনি।'

'তাদের সংখ্যা কত, অনুমান?'

'রাতে যখন তারা একত্রিত ছিল তখন পঁচিশ ত্রিশজন দেখেছি।'

'তারা তার চেয়ে বেশী নাও হতে পারে।' আহমদ দারবীশ বললো, 'তুমি তাদের কাছে কোন পশু দেখোনি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।' মার্ক লী বললো, 'আমি তাদের কাছে দু'টি উট দেখেছি। হয়ত উট আরো বেশী আছে, কিন্তু আমি দু'টিই

দেখেছি।'

'হ্যাঁ, এ উট তারা বাইরে আসার কাজে ব্যবহার করে।' আহমদ দারবীশ বললো, 'শোন মার্ক লী! তুমি মনোযোগ দিয়ে শোন! পথিকদের শিকার করার জন্য ওরা বাইরে আসে। নিশ্চয়ই সেখানে কোন সোজা রাস্তা আছে যে পথ দিয়ে তারা বাইরে আসা যাওয়া করে। কোন গোপন রাস্তা, যা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমি তোমাকে যে রাস্তা বলে দিয়েছিলাম সে রাস্তা চলাচলের সহজ রাস্তা নয়। সেখানে অবশ্যই কোন সহজ রাস্তা আছে যা ঐ উলঙ্গ লোকদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

আমি সে পদ্ধতিও চিন্তা করে ফেলেছি। পদ্ধতি হলো, সেখানে সুযোগ মত আক্রমণ করতে হবে। এতে দে াল পার হতে গিয়ে তোমার যে সাথী পড়ে মারা গেছে, হয়ত গার মত আরও কিছু লোককে জীবন দিতে হবে। কিন্তু এ কুরবানী আমাদের দিতেই হবে। বলো, পঁচিশ-ত্রিশ জন জংলী মানুষ, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও আছে, এদের মারতে বা জীবিত ধরতে তোমার কতজন লোকের প্রয়োজন? মোটের উপর একটি সংখ্যা বলো। তুমিই হবে সেই বাহিনীর নেতা।'

'আমি আপনার পরিকল্পনা বুঝতে পেরেছি।' মার্ক লী বললো, 'এ পদ্ধতিতে আমরা হয়তো তাদের হত্যা করতে পারবো, হয়তো দু'একজনকে জীবিতও ধরতে পারবো। কিন্তু তারা আমাদেরকে গুপ্তধন পাওয়ার সমস্ত রহস্য বলে দেবে এ নিশ্চয়তা আমি আপনাকে দিতে পারবো না। কবিলার একজনকে মরতে দেখলে সকলেই মরতে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। যাদের ধরে আনবো তারা আমাদের বিভ্রান্ত করতে

পারে, ভুল তথ্য দিতে পারে। আবার এমনও বলতে পারে, এখানে কিছুই নেই, আর থাকলেও আমরা কিছু জানি না। বরং তাদের কিছু লোককে যদি পালানোর সুযোগ দেই তবে আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করতে পারবো এবং এতে করে সহজ রাস্তা আমাদের জানা হয়ে যাবে।'

'তুমি খুব বুদ্ধিমান মার্ক লী।' আহমদ দারবীশ বললেন, 'বলো কতজন লোক দেব?'

'পঞ্চাশ জন।' মার্ক লী বললো, 'অধিকাংশ লোক আমার বাঁচিত হতে হবে। আমিই তাদের খুঁজে নেবো। মিশন শুরুর আগেই আমি এর নিশ্চয়তা চাই।'

'এ ধরনের শর্ত আরোপ করার দরকার কি মার্ক লী? তারচে তোমার দাবী মত পুরস্কার পাবে তুমি।' আহমদ দারবীশ বললেন।

'আমাকে গুপ্তধনের অংশ দিতে হবে।' মার্ক লী বললো, 'এত বড় ভয়ঙ্কর মিশন আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। গুপ্তধনের অনুসন্ধান করা একজন কমাণ্ডো বা গোয়েন্দার কাজ নয়। আমাকে গুপ্তধনের অনুসন্ধান বিভাগে চাকরী দেয়া হয়নি। এটা আপনার নিজস্ব মিশন। আপনার সম্মতি ছাড়া আমি দাবী করে কোন অংশ নিতে পারব না। যদি আপনার পরিকল্পনা সফল হয়ে যায়, তবে আপনি হবেন রাজ্যের শাসক, আমাকে আমার গোয়েন্দা বিভাগেই চাকরী করতে হবে।'

'এই মিশন ও পরিকল্পনা কারো ব্যক্তিগত নয়।' আহমদ দারবীশ বললেন, 'বাহ্যত এটা হবে মিশর সরকারের পরিকল্পনা। কিন্তু তুমি ভাল করেই জানো, এটা ক্রুসেডরত সম্মিলিত খৃস্টান সম্প্রদায়ের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা।'

এসব কথায় মার্ক লী মোটেই প্রভাবিত হলো না। সে তার সিদ্ধান্তে অটল। আহমদ দারবীশ নিরুপায় হয়ে গেল। কারণ সে জানতো, মার্ক লীর নেতৃত্ব ছাড়া রিম্যান্সের কবর পর্যন্ত যাওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং তার পরিকল্পনা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই আহমদ দারবীশের। মার্ক লীকে সম্মত করাতে না পেরে অবশেষে তিনি তার প্রস্তাব মেনে নিলেন।

মার্ক লী বললো, 'আমি জানিনা আমাকে কতদিন মরুভূমিতে পড়ে থাকতে হবে। আমি শুষ্ক ও কঠিন খাদ্যে অভ্যস্ত নই। আমাকে কয়েকটা বাড়তি উট দেয়া হোক, যাতে আমি ও আমার সঙ্গীরা খেয়ে বাঁচতে পারি।'

'বাড়তি উট তুমি পাবে, বলো আর কি চাই তোমার?'

'এ অভিযানে আমাদের সাথে কস্তুরীকে দেয়া হোক।'

'কস্তুরী!' আহমদ দারবীশ বিস্মিত হলেন। বললেন, 'এমন একজন কোমল নর্তকীর কি প্রয়োজন তোমার? এমন ভয়ংকর এক মিশনে কি করে তাকে পাঠাবো আমি? সে তো এ ধরনের প্রস্তাবে রাজীই হবে না?'

'রাজী সে অবশ্যই হবে। হয়তো এ জন্য আপনাকে একটু চড়া মূল্য দিতে হবে। টাকায় বাঘের চোখ মেলে আর আপনি সামান্য একটা নর্তকী জোগাড় করতে পারবেন না?' মার্ক লী বললো, 'আমি তার জন্য এমন ব্যবস্থা করব, সে যে মরুভূমিতে এবং ভয়াবহ মিশনের সাথে রয়েছে এ কথা সে অনুভবই করবে না। আমি তার সম্মান ও মূল্য বুঝি।'

এটা সেই যুগের ঘটনা, যখন কোন ধনী বণিক ও আমীর সফরে তার সুন্দরী স্ত্রীকে সঙ্গে রাখতো। কিন্তু স্ত্রীকে যদি তার

ভাল না লাগতো তবে সে তার পছন্দমত নর্তকী ও গায়িকাকে সফর সঙ্গিনী করে নিত। এই সব নর্তকী ও গায়িকারা চাহিদামত অর্থ পেলে আর কিছুই চাইতো না।

সামরিক কমান্ডাররা যুদ্ধের মাঠে সুন্দরী স্ত্রীকে সাথে না রাখতে পারলে ভাড়া করা বিলাস কন্যা সাথে রাখতো। সোনা রূপার মতই সুন্দরী নারীরা ছিল পুরুষের জন্য মূল্যবান অলংকারের মত। ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য সব সময় এ ধরনের সুন্দরী যুবতী বিলাস কন্যাদের ব্যবহার করতো।

মার্ক লী যে বিপদজনক অভিযানে যাচ্ছে তাতে কোন নর্তকী নেয়া স্বাভাবিক না হলেও মানসিক টেনশন দূর করার জন্য যদি সে দু'একজন নর্তকী সাথে রাখার ইচ্ছা পোষণ করে তবে আহমদ দারবীশ তাতে হয়তো আপত্তি করতো না। কিন্তু আহমদ দারবীশ আপত্তি তুলেছিল কস্তুরীর ব্যাপারে। কস্তুরী কোন সাধারণ নর্তকী ছিল না। সে ছিল কায়রোর সেরা সুন্দরীদের এব জন। শুধু ধনী আমীর ও বিত্তবান সওদাগরদেরই মনোরঞ্জন করতো সে।

সুদানের বাসিন্দা এই মুসলিম যুবতী কেবল অসাধারণ সুন্দরীই ছিল না, তার নাচ এবং অভিনয়েও ছিল যাদু। যে একবার তার অভিনয় দেখতো তারই মাথা ঘুরে যেত। এই কস্তুরী মার্ক লীর সঙ্গে মরুভূমিতে যেতে রাজী হবে, আহমদ দারবীশ এ কথা কল্পনাও করতে পারছে না। এদিকে মার্ক লীও গো ধরে বসে আছে। কস্তুরীকে ছাড়া সে এই অভিযানে যেতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। এবারও আহমদ দারবীশের হার হলো, কস্তুরীকে তার সাথে পাঠানোর চেষ্টা করবে বলে ওয়াদা

করল আহমদ দারবীশ।

বাছাই করা পঞ্চাশ জন লোক সংগ্রহের কাজ শুরু হল। কায়রোতে ক্রুসেডদের গোয়েন্দা ও কমাণ্ডোর সংখ্যা কম ছিল না। মার্ক লীই ছিল তাদের নেতা। তাই, মার্ক লী তাদের নিয়েই এ গোপন অভিযানে যেতে চাচ্ছিল। কারণ এরা সবাই তার বিশ্বাসী ও আস্থাভাজন ছিল। আহমদ দারবীশেরও কিছু নিজস্ব লোক ছিল, যাদের সে এই অভিযাত্রী দলে শামিল করতে চাচ্ছিল। মার্ক লীর সাথে চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরও সে এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

সুলতান আইয়ুবীর সেনানায়ক আহমদ দারবীশের কমাণ্ডো বাহিনীর সবাই ছিল মুসলমান। কিন্তু ক্রুসেডরত খৃস্টানদের প্রয়োজন ও স্বার্থ রক্ষায় এরা ছিল নিবেদিতপ্রাণ। সুচতুর আহমদ দারবীশ নিজের ঈমান বিক্রি করার পর এসব মুসলমান কমাণ্ডোদেরও গাদ্দার বানিয়ে নিয়েছিল। এরা সবাই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকে বেতন নিত কিন্তু হুকুম তামিল করতো খৃস্টানদের। বিশেষ করে ফেদাইন দলের নেতা হাসান বিন সাবাহ-এর সঙ্গে তাদের গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

আহমদ দারবীশের পত্র নিয়ে কস্তুরীর কাছে মার্ক লী নিজেই গেল। আহমদ কোন সাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল না, সে ছিল সামরিক বিভাগের উচ্চ ক্ষমতাধর এক অফিসার। মিশরের ক্ষমতায় তখন সামরিক শাসক। ফলে তার ক্ষমতার কাছে কস্তুরীর মত নর্তকীরা ছিল অসহায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কস্তুরী এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হলো।

এবার মার্ক লী তাকে বললো তার মনের কথা। বলল,

'ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যাসের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি আমি। সে সব ধনরত্ন, হীরা-জহরত উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা। এ অভিযানে যারা থাকবে সেই সম্পদের ছিটেফোটা ভাগও যদি তারা পায় তবু একেকজন মস্ত ধনী হয়ে যাবে। এই সৌভগ্যের অংশীদার করতে চাই আমি তোমাকে। এ জন্যই তোমাকে দলে নেয়ার প্রস্তাব করেছিলাম আমি। তুমি রাজী হয়েছো দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

গুপ্তধনের কথা শুনে লোভে চকচক করে উঠল কস্তুরীর চোখ। একটু আগেও যেখানে নিরাসক্ত একটি ভাব বিরাজ করছিল তার মধ্যে, সেখানে আগ্রহ ও উত্তেজনার টানটান অনুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য আকুপাকু করে উঠল মন। গুপ্তধনের নেশা পেয়ে বসল তাকেও। সে উতলা কণ্ঠে জলদি অভিযানে বেরিয়ে পড়ার তাগাদা দিল মার্ক লীকে।

মার্ক লী ছিল ধুরন্ধর ও চালাক চতুর লোক। সে কস্তুরীর হৃদয়ে স্বপ্ন ও আশার ঝড় তুলতে সমর্থ হলো, রাণী ক্লিওপেট্টা বানিয়ে দিল তাকে।

যতই বিখ্যাত হোক, কস্তুরী ছিল একজন নর্তকী। এরা শরীর ও সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হয়, স্বর্ণলংকার এবং হীরা-জহরতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, কিন্তু সহজে আবেগতাড়িত হয় না। কিন্তু মার্ক লী তার মনে গুপ্তধনের এমন নেশা ধরিয়ে দিল যে, কস্তুরী এই প্রথম সম্পদের আকর্ষণের সাথে সাথে প্রচণ্ড এক আবেগের স্রোত অনুভব করল তার হৃদয়সমুদ্রে।

তবে মার্ক লী ফেরাউনের অমূল্য সম্পদ কোথায় এবং কেন

ব্যয় করবে সে কথা তাকে বলেনি।

শক্ত সামর্থ, সাহসী ও কমাণ্ডো অভিযানে পারঙ্গম পঞ্চাশজন লোক খুঁজে বের করতে পনেরো-বিশ দিন লেগে গেল। এরা অধিকাংশই ছিল ক্রুসেড কমাণ্ডো। যে কজন মুসলমান ছিল, তারাও ছিল খৃস্টানদের তল্পীবাহক। সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার পর শুরু হল অভিযান। অভিযাত্রীরা যাত্রা করল নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

কায়রো থেকে তারা বেরোলো আলাদাভাবে। তিন-চার জনের একেকটি ক্ষুদ্র দল মুসাফিরের বেশে, ব্যবসায়ী হিসাবে কায়রো থেকে বের হয়ে গেল।

কস্তুরী রওনা হলো একজন পর্দানশীল সম্মানিত মহিলা সেজে। মার্ক লী সাজলো তার স্বামী।

তাদের সাথে আছে দু'জন সফর সঙ্গী। একজন খৃস্টান, অন্যজন ছিল মুসলমান। মুসলমান লোকটির নাম ইসমাইল। আহমদ দারবীশ তাকে এ দলে ঢুকিয়েছে। এ লোক অর্থের বিনিময়ে বা নিজের স্বার্থে যে কোন অন্যায় কাজ করতে পারতো। সে ভাড়াটে খুনী হিসাবেও কাজ করতো। সমাজের নিকৃষ্ট লোক হওয়ার পরও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাকে ভয় করত, সালাম দিত।

মার্ক লী তার স্বভাব চরিত্র ভাল করেই জানতো। কিন্তু এই মিশনে সে তাকে বিশ্বস্ত বলেই গণ্য করল। অভিযাত্রীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে আঠারো মাইল দূরে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় একত্রিত হতে বলে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক দলই তীর, ধনুক ও তলোয়ার সাথে নিয়েছে। তাদের সাথে রশি এবং গর্ত খোড়ার সরঞ্জামও ছিল।

মার্ক লীদের দলই সবার আগে সেখানে গিয়ে পৌঁছলো।

মার্ক লী ওদেরকে পাহাড়ের এক নির্জন এলাকায় নিয়ে গেল। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সেখানে তারা তাবু টানিয়ে ফেলল। তারা আশা করতে লাগল, রাতের মধ্যেই তাদের অন্যান্য সাথীরাও এসে পৌঁছে যাবে।

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ আগে। এতক্ষণ ওরা তাবুর বাইরে বসে গল্পগুজব করছিল। মার্ক লী বলল, 'এবার তাবুতে ফিরতে হয়। তোমাদের একজন সব সময় পাহারায় থাকবে, অন্যজন ঘুমোবে।'

কস্তুরীর হাত ধরে মার্ক লী উঠে দাঁড়াল। ইসমাইল তাকিয়ে রইল কস্তুরীর দিকে। কস্তুরীকে ও ভাল করেই চেনে, কিন্তু কস্তুরী জানে না ইসমাইল কি দুরন্ত ও ভয়ংকর লোক।

০

ক্রাকের রণাঙ্গণে নূরুদ্দিন জঙ্গীর জয় সুসম্পন্ন হলো। জয় লাভের পরপরই তিনি ক্রাক দূর্গ ও শহরের আইন-শৃংখলা ও শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার দিকে মনযোগ দিলেন। তাঁর টহলদার বাহিনী শহরের বাইরেও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। এর ফলে খৃস্টানরা আবার সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করবে এ সুযোগ শেষ হয়ে গেল।

সুলতান খবর পেয়েছিলেন, পালিয়ে যাওয়া খৃস্টান সৈন্যদের কারো কারো মধ্যে পূনরায় সংগঠিত হয়ে অতর্কিতে রাতের আঁধারে হামলা করার চিন্তা কাজ করছে। এর প্রমাণও তিনি পেলেন। টহল বাহিনীর সাথে খৃস্টানদের এ ধরনের কয়েকটা ছোট ছোট দলের সংঘর্ষ হলো এবং তারা অল্পতেই পরাজয় বরণ করে পালিয়ে গেল।

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সুলতান

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী এমন এক রণাঙ্গণে যুদ্ধ করছিলেন, মিশরে যে রণাঙ্গণ খৃষ্টান ও তাদের দালালরা খুলে রেখেছিল। এই সেক্টর ছিল আরো ভয়াবহ, আরো ভয়ংকর ও জটিল ।

সুলতান আইয়ুবী সশস্ত্র লড়াইয়ে যেমন পারঙ্গম, কূটনীতি ও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায়ও তেমনি সজাগ, সচেতন ও সক্ষম ছিলেন। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সেক্টরে তিনি সফল আঘাত হেনেছেন এবং এখনো ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছেন। কিন্তু এমন কিছু সেক্টর তখনো ছিল যার খবর তাঁর জানা ছিল না। ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কবর ও গুপ্তধন অনুসন্ধানের অভিযান তার অন্যতম।

নৈশভোজের পর সুলতান আইয়ুবী সেনাপতি ও অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছেন। সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা ছাড়াও এতে হাজির হয়েছেন গোয়েন্দা বাহিনী প্রধান আলী বিন সুফিয়ান এবং পুলিশ বাহিনী প্রধান গিয়াস বিলকিস।

সুলতান আইয়ুবী আজই ভোরে সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর এক দীর্ঘ পত্র পেয়েছেন। বৈঠকের শুরুতেই তিনি সেই দীর্ঘ চিঠির প্রয়োজনীয় অংশটুকু সবাইকে পাঠ করে শোনালেন।

জঙ্গী লিখেছেন, 'প্রিয় সালাহউদ্দিন, আল্লাহ তোমাকে সুস্থ শরীরে সহিসালামতে বাঁচিয়ে রাখুন। ইসলামের হেফাজতের জন্য তোমার বিশেষ প্রয়োজন। ক্রাক ও আশেপাশের এলাকা এখন শত্রু মুক্ত। টহল বাহিনী দূর দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমদিকে ক্রাকের বাইরে পালিয়ে যাওয়া ক্রুসেডারদের ছোটখাট দল আমাদের টহল বাহিনীর সাথে

বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও এখন অবশ্য সে সমস্যা নেই।

তোমার কমাণ্ডো ও গোয়েন্দা বাহিনীর প্রশংসা না করে পারছি না। তারা দুর্দান্ত সাহসী, পরিশ্রমী এবং নিবেদিতপ্রাণ। তুমি তাদের গড়ে তুলতে যে পরিশ্রম ব্যয় করেছো, তারা এখন তার মূল্য দিচ্ছে। তোমার গোয়েন্দা বিভাগ তার চেয়েও বীর, সাহসী, হুশিয়ার এবং বিচক্ষণ! তাদের চোখ দিয়ে আমি এত দূরে বসে থেকেও শত্রুদের প্রতিটি গতিবিধি স্পষ্ট দেখতে পাই।

তাদের কাছ থেকে যে তথ্য পাচ্ছি তাতে আমার মনে হচ্ছে, খৃস্টানরা আবার আমাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। তারা উত্যক্ত করছে যেন আমরা অগ্রসর হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালাই। তুমি জান, আমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস আমাদের গন্তব্য স্থান। আমাদের সে লক্ষ্যস্থল এখনো অনেক দূর। আমি জানি, তুমি এই দূরত্ব ও লম্বা সফর নিয়ে ভীত হওয়ার লোক নও। আমিও দূরত্ব নিয়ে ভাবছি না, ভাবছি পথের নানা অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন নিয়ে। বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে আমাদের অনেক দূর্গ জয় করতে হবে। এইসব দূর্গের মধ্যে কয়েকটি খুবই মজবুত।

ক্রুসেডাররা আমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছার পথে অনেকগুলো প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করে রেখেছে। তোমার গোয়েন্দা বিভাগ বলছে, ওরা আবার শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা গ্রীস ও ইটালীর নৌবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করে মিশরের উপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওরা মিশরের উত্তরাঞ্চলে ভূমধ্যসাগর তীরে সৈন্য নামাবে। সে জন্য তোমাকে অবস্থার প্রেক্ষিতে সতর্ক থাকতে

হবে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করো। বেশী করে দূরপাল্লার অগ্নিনিক্ষেপকারী ভারী মেনজানিকের মজুদ গড়ে তোল। উত্তরাঞ্চলের সমুদ্র তীরে শত্রুদের যুদ্ধ জাহাজ এলে তাদের কোন বাঁধা দিও না। তাদেরকে কুলে ভিড়ার সুযোগ দিও। তারা যেন এই আনন্দেই মশগুল থাকে যে, তারা তোমার অজ্ঞাতেই এসে পৌঁছে গেছে। তাদের সৈন্যরা যখন জাহাজ থেকে নেমে যাবে তখন খালি জাহাজগুলোতে অগ্নিবর্ষণ করবে, আর ক্রুসেড বাহিনীকে তাদের পছন্দ মত জায়গায় আশ্রয় নেয়ার সুযোগ দেবে।

তোমার বর্তমান সমস্যা ও অসুবিধার কথা আমার অজানা নয়। তোমার কাসেদ সবই আমাকে বলেছে। কাবার প্রভূর কসম! ক্রুসেডদের সব সম্রাট যদি একত্র হয়ে তুফানের বেগে ধেয়ে আসে তবুও রাসূলের উম্মতের কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না। প্রতিটি ময়দান প্রমাণ করছে, মুসলিম জাতি কুরবানী দিতে জানে। এ জাতি আত্মত্যাগের বলে বলীয়ান জাতি।

কিন্তু আফসোস সালাহউদ্দিন, কিছু ঈমান বিকানো গাদ্দার মুসলিম জাতির পায়ে গোলামীর শিকল পরাতে ব্যস্ত। তাদের কারণেই আজ তুমি কায়রোতে আটকা পড়ে আছো। তাদের কারণেই বাগদাদ তোমাকে ডাকছে। এই গাদ্দাররা নারী, মদ ও অঢেল অর্থ ছড়িয়ে আমাদের মাঝে ফুটো তৈরী করছে। যদি আমাদের ঘরে শান্তি ও বিশ্বাস বিরাজ করতো, তবে আমরা দু'জন মিলে ক্রুসেডদের সঙ্গে সহজেই মোকাবেলা করতে পারতাম। কিন্তু কাফেররা এমন ভয়ানক চাল চেলেছে যে,

মানুষের আচার আচরণ ও কাজ দেখে আজ আর চেনার উপায় নেই, কে মুসলমান আর কে কাফের। মনে হয় যেন, মুসলমানরাই আজ কাফের হয়ে গেছে। এই অচেতন মুসলমানরা এতই নির্জীব যে, শত্রুরা তাদের বোন ও কন্যাদের ইজ্জত-আবরু, মান-সম্ভ্রম লুট করছে, এ দৃশ্য দেখার পরও তাদের চেতনায় কোন কাঁপন জাগে না, অনুভূতি নাড়া খায় না।

ক্রাকের মুসলমানরা খুব দুরবস্থার মধ্যে ছিল। খৃস্টানরা তাদের ওপর যে জুলুম অত্যাচার করেছে, সে সব কাহিনী যদি শোনো তবে তোমার চোখের অশ্রু রক্ত হয়ে ঝরবে। আমি আমার জাতির গাদ্দারদের কেমন করে বুঝাবো যে, শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব শত্রুতার চেয়েও ভয়ংকর!

তুমি আফসোস করে বলেছ, তোমার দ্বীনী ভাই, তোমার বিশ্বস্ত অফিসার, হাকিম এবং কমান্ডাররা তোমার বিচারে মৃত্যুদণ্ড পাচ্ছে। আইয়ুবী! আমার আফসোস শুধু এখানেই নয়, আমার আফসোস হচ্ছে এ জন্য যে, এইসব গাদ্দারদের খৃস্টান বন্ধুরা তাদের পরিণতি দেখে হাসছে আর বলছে, দেখো, মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের কেমন করে হত্যা করাচ্ছি। অথচ গাদ্দারদের কিছুতেই বুঝাতে পারছি না, কে তাদের বন্ধু আর কে তাদের শত্রু!

তুমি কখনও গাদ্দারদের ক্ষমা করবে না! মৃত্যুদন্ডই তাদের উপযুক্ত শাস্তি। এমন যেন না হয়, স্নেহ মমতা তোমাকে শরীয়তের বিধান পালনে গাফেল বানিয়ে ফেলে! আমি তোমার অপেক্ষায় থাকলাম।

তুমি যখন আসবে বেশী করে সৈন্য সঙ্গে আনবে। খৃস্টানরা তোমাকে এক জায়গায় আটকে রেখে যুদ্ধ করে তোমার শক্তি

নষ্ট করতে চায়। এমন যেন না হয়, বায়তুল মুকাদ্দাস আসার পথেই তুমি সব সৈন্য হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ো।

তুমি আসার আগে মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে আসবে। সুদানীদের দিকে ভাল করে খেয়াল রাখতে বলবে গোয়েন্দাদের। আমি জানতে পেরেছি, তোমাকে অর্থনৈতিক সমস্যাও মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে অচিরেই তোমার কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে যাবে। যত শীঘ্র পার কায়রো থেকে বেরিয়ে এসো। কিন্তু সাবধান! ভেতর ও বাইরের অবস্থা সব সামাল দিয়ে আসবে। আল্লাহ তোমার সহায় হউন।

০

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বৈঠকে উপস্থিত সকলকে এই চিঠি পড়ে শোনালেন। আরেকটি আশার খবর শোনালেন সবাইকে, এখন সেনাবিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য পল্লী এলাকা থেকেও যুবকরা আসতে শুরু করেছে। দুশমন ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করে রেখেছিল এতদিন, তা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দু'এক জায়গায় তার প্রভাব থাকলেও অচিরেই তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যে ষড়যন্ত্র মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে শুরু হয়েছিল তারও মোকাবেলা করা হয়েছে। ভণ্ডপীরের ফেতনা নির্মূল করার পর খৃস্টানরা কয়েকজন ইমামকে টার্গেট করে তাদের দিয়ে নতুন এক ফেতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। এই ইমামরা নিজ নিজ এলাকায় নিজেকে আল্লাহর দূত বলে দাবী করল। তাদের শিষ্যরা প্রচার করে বেড়াতে লাগল, আমাদের মধ্যে এমন হুজুর এসেছেন, যিনি বিপদের সময় সরাসরি

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

এই ইমামরা খৃষ্টানদের দেয়া অর্থ বিলিয়ে একদল এজেন্ট তৈরী করল। এই এজেন্টরা হয়ে গেল হুজুরের শিষ্য। এই শিষ্যরা হুজুরের নানা কেরামতি প্রচার করতে থাকল। তারা মানুষকে এই ধারণা দিতে লাগল যে, সাধারণ মানুষ কোন কিছুই খোদার কাছে চাইতে পারে না। আল্লাহও সরাসরি তাদের দাবী ও আবেদন শোনেন না।

সুলতান আইয়ুবী খবর পাওয়ার সাথে সাথেই সেই ইমামদের মসজিদ থেকে বহিষ্কার করলেন। সেখানে এমন ইমাম নিযুক্ত করলেন, যারা কুরআন সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

তারা জনগণকে বললেন, মুসলমানদের আল্লাহ শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার জন্য সমান। আমীর-গরীব, শাসক-শাসিত সবারই আল্লাহ একজন। তিনি তার সব বান্দার আবেদন শোনেন এবং দোয়া কবুল করেন। তিনি প্রত্যেকের ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দেন এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেন। কেবল গরীব-মিসকিন নয়, পীর-বুজুর্গ, আমীর-সওদাগর, এমনকি রাজা-বাদশাহও এই আইনের অধীন।

তিনিই সবাইকে আলাদা ভাগ্য দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং মরার পর দুনিয়ায় ভাগ্যগুণে তার ওপর যে দায়িত্ব পড়েছিল সেই দায়িত্বের আলোকে তার কাজের হিসাব নেবেন। আপনার কাজের হিসাব নেবেন আপনার কাছ থেকে, আমার কাজের হিসাব নেবেন আমার কাছ থেকে। একমাত্র হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ছাড়া কোন নবী রাসূলও সেদিন কারো জন্য কোন সুপারিশ করতে পারবে না, পীর-বুজুর্গ,

ইমাম-হুজুর তো দূরের কথা।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বললেন, 'বন্ধুগণ, আমি আমার জাতির মধ্যে এই শক্তি, আবেগ ও প্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছি, যেন তারা নিজেকে ও আল্লাহকে জানার চেষ্টা করে। মানুষ যদি আল্লাহ ও তার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্কের কারণে পরস্পরের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তা বুঝতে পারে, তবে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি আর তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

ক্রাক থেকে কায়রো এসে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, শত্রু শুধু যুদ্ধের ময়দানেই যুদ্ধ করছে না, শয়তান যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল আল্লাহকে সেই চ্যালেঞ্জই বাস্তবায়ন করছে ওরা। শয়তান বলেছিল, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডাইনে থেকে, বায়ে থেকে অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে হামলা চালাবো। ইহুদী ও খৃস্টানরা এখন জোট বেঁধে সে দায়িত্বই পালন করছে। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, বিপথগামী করার জন্য চতুর্মুখী হামলা চালাচ্ছে।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে তোমাদের, শয়তানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সেদিন আল্লাহ বলেছিলেন, যারা আমার খাঁটি বান্দা তাদেরকে তুমি কিছুতেই বিভ্রান্ত ও পরাজিত করতে পারবে না।

বন্ধুরা আমার! সেই দিন থেকে পৃথিবীর মানুষ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল হয়ে গেল শয়তানের তাবেদার, আরেক দল হয়ে গেল আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর সৈনিকদের কাজ হলো আল্লাহর সৃষ্টির হেফাজত করা, মানবতার পতাকা সমুন্নত রাখা। আর শয়তানের তাবেদারদের কাজ হলো

মানুষের মাঝে পশুত্ব ও বর্বরতার বিস্তার ঘটানো। সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে হক ও বাতিলের চিরন্তন সংঘাত। সে সংঘাত অতীতেও চলেছে, ভবিষ্যতেও চলবে। পৃথিবীর ইতিহাস মূলত এই হক ও বাতিলের চিরন্তন সংঘাতের ইতিহাস।

এ লড়াইয়ে যুগে যুগে যারা আল্লাহর দলে নিজেদের নাম লিখিয়েছে, আমরাও সেই সৌভাগ্যবানদের কাতারে শামিল হয়েছি। আমাদের প্রথম কাজ সত্য ও মিথ্যাকে সনাক্ত করা এবং সত্যের স্বপক্ষে আল্লাহর সৈনিক হিসাবে আমাদের যথার্থ ভূমিকা পালন করা।

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো, দুশমন তোমাদের মনে নতুন আকিদা বিশ্বাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই মিশনে সর্বাধিক অগ্রগামী ইহুদীরা। এরা কখনো তোমাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে আসবে না। তোমাদের ঈমান দুর্বল করার জন্য এরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাদের দোসর হিসাবে কাজ করছে খৃস্টানরা।

এই কাজে তারা এরই মধ্যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। তোমরা সচেতন ও সচেষ্ট না হলে এমন এক সময় আসবে, যখন এই অভিশপ্ত জাতি মুসলমানদের ঈমানী শক্তি নিঃশেষ করে দেবে।

যদি নিজেদেরকে এই অধ:পতনের হাত থেকে উদ্ধার করতে চাও, তবে আর দেরী নয়, ছুটে যাও নিজের জাতির কাছে। তাদের দু:খ বেদনার সাথী হও। অহমিকা আর অহংকারের ময়লা মুছে ফেল নিজের শরীর থেকে। নিজেদেরকে শাসক ও জনগণকে শাসিত ভেবে তাদের সাথে

অসদাচরণ করো না। তারা তোমাদের প্রজা এই চিন্তা ছেড়ে দাও। তুমি যেই খোদার বান্দা তারাও তারই গোলাম। তোমার মত তারাও আল্লাহর খলিফা, তারই প্রতিনিধি। নিজে এই বিশ্বাসে বলীয়ান হও এবং জাতির প্রতিটি ব্যক্তির মনে এই অনুভূতি তীব্রতর করো। সবার মধ্যে এমন মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করো যেন তারাও জাতির শক্তি ও সম্মানের জন্য খুশী মনে নিজের জীবন কুরবানী করতে পারে।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আরো বললেন, 'ক্রুসেডদের কাছে আছে নারী, অর্থ ও শরাব আর কমজোর ঈমানদারদের কাছে আছে এগুলোর জন্য লোভ ও লালসা। আমাদের এখন প্রয়োজন, মুসলমানরা যেন এই লালসার লাগাম টেনে ধরতে পারে সেই মিশনে ঝাপিয়ে পড়া। জাতির মন মানসিকতা থেকে অর্থ, মদ ও নারীর নেশা দূর করতে হবে। আর এর একমাত্র দাওয়াই হচ্ছে ঈমানের বলিষ্ঠতা।'

'আমীরে মুহতারাম!' একজন সম্মানিত সেনাপতি বললেন, 'আমাদের ধন-সম্পদের প্রয়োজন আছে। অর্থাভাবে আমাদের খরচ নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আমাদের বিভিন্ন কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।'

'ইনশাআল্লাহ, এই অসুবিধা দূর হয়ে যাবে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমাদের এই বাস্তবতা স্বীকার করতেই হবে, মুসলমানদের কাছে অর্থ ও সৈন্য সবসময়ই কম ছিল এবং থাকবে। আমাদের রাসূল (সা.) তাঁর প্রথম যুদ্ধে মাত্র তিনশ তেরো জন মুজাহিদ নিয়ে ইসলামের সফলতার দ্বার উদঘাটন করেছিলেন। কেবল অর্থ নয়, জনবল, অস্ত্রবল সবকিছুই তাদের কম ছিল। কিন্তু তাতে ইসলামের অগ্রযাত্রা

ব্যহত হয়নি।

এরপরও কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যত যুদ্ধ হয়েছে তাতে মুসলমানরা কম শক্তি নিয়েই যুদ্ধ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী এবং তাঁর সাহাবীগণ পেটে পাথর বেঁধে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু আপোষ করেননি। এভাবেই রাসূলের সাহাবীরা আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আর মুসলমান যখন আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন তাদের অভাব মোচনের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে বহন করেন। যে কারণে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে আরবের মাটি থেকে অভাব অনটন এমনভাবে দূর হয়ে গিয়েছিল যে, আরবের মাটিতে জাকাত নেয়ার মত কোন লোক ছিল না, জাকাতের অর্থ তাদেরকে আরবের বাইরে পাঠাতে হতো।

আজ মুসলমানদের কাছে ধন-সম্পদ কম নেই। সমস্যা হচ্ছে, সেই সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে মাত্র কয়েকজন লোকের কাছে। ছোট ছোট রাজ্যের রাজা ও সুলতানদের কাছে অর্থের পাহাড় জমে আছে।

'সম্পদের স্তূপ এখানেও পড়ে আছে সালারে আজম!' গিয়াস বিলকিস বললেন, 'যদি আপনি আদেশ দেন তবে আমরা এক নতুন অভিযান শুরু করতে পারি। আপনি জানেন, মিশর ধন-সম্পদের দেশ। অতীতের শাসক ফেরাউনরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। মৃত্যুর সময় তারা সমস্ত সম্পদ, ধনরত্ন কবরে নিয়ে গেছে। এই ধন-সম্পদ কাদের ছিল? এ সবই ছিল গরীব জনসাধারণের। জনগণকে ক্ষুধার্ত রেখে তাদের অর্থ সম্পদ সঙ্গে নিয়ে কবরে চলে যায় ফেরাউনরা। যুগের মানুষেরা তাদের খোদা মানতো। জনগণের ভাগ্য নির্ভর করতো

ফেরাউনের হাতে।

পাহাড় কেটে ফেরাউনরা স্বপ্নের কবর বানিয়েছিল। কবর না বলে তাকে সুরম্য মহল বলাই ভাল। সেই মহলে তাদের সঞ্চিত ধনরত্ন আজো জমা আছে। যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমরা ফেরাউনের ভূগর্ভস্থ কবরের অনুসন্ধান চালিয়ে জনগণের সে অর্থ-সম্পদ উদ্ধার করে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে পারি।'

গিয়াস বিলকিসের প্রস্তাব উপস্থিত লোকদের মধ্যে বেশ প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। অনেকেই তার প্রস্তাব সমর্থন করলো।

'খুবই ভাল প্রস্তাব সম্মানিত আমীর! এ ব্যাপারে আমরা আগেই কেন চিন্তা-ভাবনা করিনি ভাবছি।'

'আমরা এই মিশনে সৈন্যদের ব্যবহার করতে পারি।'

'বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এ জন্য একটি জরিপ দল গঠন করা যেতে পারে।'

এভাবে একেকজন একেক মন্তব্য করতে লাগল। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলতে চাইলো এ ব্যাপারে। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী একদম চুপচাপ। কিছুই বলছেন না তিনি। সবাই যখন অনুভব করলো, আমীর সাহেব নিবর আছেন, তখনই কেবল তারা চুপ করল।

সবাই চুপ করলে সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'গিয়াস বিলকিস যে প্রস্তাব পেশ করেছে আমি এমন কোন মিশনের অনুমতি দিতে পারি না।'

বৈঠকের সবাই আশাহত ও নিরব-হয়ে গেল। এমন একটি প্রস্তাব সুলতান নাকচ করে দেবেন এটা কেউ আশা করেনি।

তিনি আবার বললেন, 'আমি চাই না, আমার মরার পর

ইতিহাস আমাকে 'কবর চোরা' বলে আখ্যায়িত করুক। এমনটি করলে, আমি একা নই, এ কলঙ্কের দায় তোমাদেরও বহন করতে হবে। ভবিষ্যত বংশধরেরা বলবে, সালাহউদ্দিনের পরামর্শদাতা উজির ও সেনাপতিরা সবাই কবর চোর ছিল। আর ইহুদী খৃস্টানরা এই কলঙ্কের কথা আরও রঙ মিশিয়ে বেশী করে প্রচার করবে। তোমাদের এই কুরবানী, ইসলামের জন্য এত ত্যাগ, সব ডাকাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, ইসলামের গৌরব চির ম্লান হয়ে যাবে, ঘৃণিত হয়ে যাবে।'

'আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করুন, সম্মানিত আমীর!' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'কিছু কালের জন্য মিশর খৃস্টানদের অধিকারে ছিল। তারা এসেই এখানে প্রথম গুপ্তধনের অনুসন্ধান শুরু করে। কায়রোর পুরাতন ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে তারা এক ফেরাউনের কবর উদ্ধার করেছিল। সেখান থেকে তারা সব কিছু নিয়ে গেছে।

খৃস্টানদের শাসন বেশী দিন ছিল না, থাকলে তারা সব কবর খুঁজে বের করতো এবং ধনরত্ন সব নিয়ে যেতো। সম্মানিত গিয়াস বিলকিস ঠিকই বলেছেন, এই ধনভাণ্ডারের মালিক ফেরাউন নয়, দেশের জনগণ। দেশপ্রেমিক সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সম্পদ জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেয়া। ফেরাউনের গুপ্তধন জনসাধারণের কল্যাণ, উন্নতি এবং জাতির সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করার মধ্যে আমি কোন অসততা ও অকল্যাণ দেখি না।'

'কিন্তু আলী!', সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এই ধনভাণ্ডার তোমাদের হাতে এলে তোমরা যে নিজেরাই ফেরাউন হয়ে

যাবে। মানুষকে এই দুঃসাহস কে দিয়েছিল যে, সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করে? ধন-সম্পদ ও অর্থের প্রাচুর্য মানুষকে এমন ক্ষমতাধর বানিয়ে দিল যে, সে তার পদতলে মানুষের সিজদা দাবী করে বসল। তুমি বলছো, খৃস্টানরা এক ফেরাউনের কবর লুট করেছে। কিন্তু তুমি জানো না, যখন প্রথম ফেরাউনেব লাশ সমস্ত ধনরত্নসহ মাটির নিচে দাফন করা হয়, তখন থেকেই কবর চুরি শুরু হয়ে গিয়েছিল। যার কাছে নিজের পরিচয় স্পষ্ট নয়, সে মানুষ হিংস্র পশুর মত, লোভী কুত্তার মত।

প্রথম ফেরাউনের কবরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় ফেরাউন। দ্বিতীয় ফেরাউনের কবর লুট করেছিল তৃতীয় ফেরাউন। এভাবেই কবর চুরি কিছু মানুষের পেশা হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেক ফেরাউন তার জীবদ্দশায়ই তার কবর এমন গুপ্ত স্থানে তৈরী করাতো, যার খবর কেউ জানতো না। মৃত্যুর পর তার লোকেরা এমন ভাবে কবরের মুখ বন্ধ করত, যেন কেউ তা খুলতে না পারে এবং কেউ তার সন্ধান না পায়। এমনকি গোরখোদকসহ যারা তার খবর জানতো তাদেরকে হত্যা করা হতো।

তারপর যখন ফেরাউনের যুগ শেষ হয়ে গেল, তখনও ঐ গোপন ধনভাণ্ডারের অন্বেষণ অব্যাহত থাকে। আমি জানি, ফেরাউনের এমন অনেক কবর আছে যার খবর কেউ জানে না। সে সব কবর মাটির তলায় এখনো রাজমহলের মত টিকে আছে। দুনিয়া প্রলয় হওয়ার আগ পর্যন্ত মিসরের শাসক ও আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তি এই কবর খুঁজে বেড়াবে।

ফেরাউনের সাম্রাজ্য কেন ধ্বংস হয়েছে, জানো? শুধু এই

কারণে যে, তারা সম্পদের দাস হয়ে গিয়েছিল। দেশের জনগণকে তারা বুঝিয়েছিল, তোমার অর্থ আছে তো সম্মান আছে। যদি তোমার পকেট শূন্য হয়, তবে তুমি ও তোমার বৌ-বেটিও সম্পদওয়ালার সম্পদে পরিণত হবে। হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে সম্পদের দাসদের সারিতে দাঁড় করিও না। আমি আমার জাতিকে বলতে চাই, ধনরত্ন আসল সম্পদ নয়, মানুষের আসল সম্পদ ঈমান!

সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়নি, মানুষের ব্যবহারের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সত্য যে সমাজ বুঝবে না, সে সমাজে মানুষ ও মানবতা নিরাপদ নয়। এই সত্য জনগণকে তখনই বুঝানো সম্ভব, যখন মুসলিম নেতৃবৃন্দ ধন-সম্পদের লালসা পরিত্যাগ করতে পারবে। সম্পদের মালিকানা যেই আল্লাহর, আমাদের কাজ, আমাদের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব সেই আল্লাহর হাতে তুলে দেয়া, সম্পদের মোহে নিজের ঈমান আমল বিক্রি করা নয়।'

'আমি ব্যক্তিগত লালসার বশে সে সম্পদ আহরণের কথা বলিনি। জাতীয় কল্যাণের প্রয়োজনকে সামনে রেখে উদ্যোগ নিতে বলেছি।' বিনীত কণ্ঠে বলল আলী।

'আমি বুঝতে পারছি, গুপ্তধন আহরণের লোভনীয় প্রস্তাব নাকচ করা তোমাদের কারো পছন্দ হচ্ছে না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমার কথা বুঝার জন্য তোমাদের বুদ্ধির সাথে সাথে বিবেককেও একটু কাজে লাগাতে হবে। আমার বিবেক বলছে, সম্পদের অভিশাপ মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। অনাকাঙ্খিত খাত থেকে অঢেল সম্পদ হাতে পেলে মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠে। আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা কমে গিয়ে

মানুষ তখন যে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে নিজের সামর্থ বিবেচনা করে। মুসলমানদের ঈমান ও একীনের এ পরিবর্তন কখনোই তাদের মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি, বরং পদে পদে পরাজয়ের কলঙ্ক লেপন করেছে।

যদি আমার কাছে যুদ্ধের ঘোড়া কেনার সামর্থ না থাকে তবে আমি পায়ে হেঁটে সৈন্যদের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাস যাবো, মৃতের কাফন চুরি করে ঘোড়া ক্রয়ের জন্য বসে থাকবো না। আমার লক্ষ্য, বায়তুল মুকাদ্দাস খৃস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করা, ঘোড়া খরিদ করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

এই গুপ্তধন তোমাদের হাতে এলে, সম্ভাবনা আছে, তোমরা একে অপরের দুশমন না হলেও একে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখবে। একদিকে তোমাদের হাতে এসে সম্পদ জমা হবে, অন্যদিকে মানুষের প্রতি তোমাদের অন্তরে যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা-আছে তা নিঃশেষ হতে থাকবে। আমাদের মধ্যে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদের যে প্রেরণা আছে সেখানে পরিবর্তনের সূচনা হবে। বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে শৈথিল্য এলে তা আর তোমার কাছে অন্যায় মনে হবে না।

অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি মানুষকে খোদা বানিয়ে দেয়। ফেরাউনরা সেই খোদায়ীর ঘোষণা দিয়েছিল, তোমরা হয়তো ঘোষণা না দিয়ে আচার আচরণে তার প্রকাশ ঘটাবে। কিন্তু ফেরাউনের খোদায়ীত্ব যেমন তাকে আকাশের উপরে তোলেনি, জমিনের উপরেও রাখেনি, বরং জমিনের নিচে অন্ধকার কবরে নিয়ে গেছে, তোমরাও সেখানেই যাবে। শুধু প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর কতটা প্রিয় বান্দা থেকে তোমরা

সেখানে যেতে পারবে।

আমার সাথী ভাই ও বন্ধুরা! আমি আর এ অপরাধের দুনিয়া সৃষ্টি করতে চাই না। তোমরা গুপ্তধনের লালসা মুক্ত হও। গুপ্তধন মানুষের মাঝে এমন লালসার বিস্তার ঘটায় যা নেশার চেয়েও মারাত্মক এবং ভয়ংকর। এ নেশা মানুষকে পশুতে পরিণত করে, বন্ধুকে শত্রু বানায়।

এ পথে পা বাড়ালে তোমাদের মাঝে যে গাদ্দার আছে তার সংখ্যা আরও বাড়বে। তোমরা দু'জন গাদ্দার হত্যা করলে নতুন করে জন্ম নেবে চারজন।

সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের ভাগ্যকে গড়ে নাও! এমন কোন কাজে জড়িয়ে পড়োনা, যে কাজের ব্যস্ততা তোমার ঈমানকে দূর্বল করে দেবে। মনে রেখো, শয়তান তোমার বন্ধু নয়, শত্রু। সুযোগ পেলে সে তোমাকেও গাদ্দার বানিয়ে ফেলবে। এ জন্য যুক্তি তর্কের তার কোন অভাব হবে না। ফেরাউন কবরে আছে, তাকে মাটির নিচেই পড়ে থাকতে দাও।'

উপস্থিত লোকজনের মাথা থেকে গুপ্তধন আবিষ্কারের উচ্ছ্বাস দূর হয়ে গেল। বৈঠকে নেমে এল প্রশান্তি। গিয়াস বিলকিস বলল, 'সুলতান, আমি তো শুধু আমার মাথায় যে চিন্তা এসেছিল তা পেশ করেছি। অভিযানে যাওয়া না যাওয়া তো আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আপনার বিচক্ষণতা বরাবরই আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছে।'

সুলতান আইয়ুবী একটু হাসলেন। বললেন, 'গিয়াস! হঠাৎ করে আজ তোমার মনে এই গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা জেগে উঠলো কেন? এখানে তো অনেক বছর ধরে আছো, কই, এর

আগে তো এ নিয়ে তোমাকে চিন্তা-ভাবনা করতে দেখিনি?'

'সালারে আজম! আমি এসব নিয়ে কখনও চিন্তা করিনি।' গিয়াস বিলকিস বললো, 'প্রায় দুই মাস আগে লাইব্রেরী ইনচার্জ আমাকে বললেন, পুরাতন কাগজপত্রের মধ্য থেকে কিছু কাগজ হারিয়ে গেছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এই কাগজগুলোতে কি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল? তিনি আমাকে বললেন, এ কাগজগুলোর এখন আর তেমন কোন গুরুত্ব নেই, এতে ফেরাউনের যুগের খুবই পুরাতন ও অস্পষ্ট কিছু নকশা ও লেখা ছিল। কাগজগুলো ছিল পোকায় খাওয়া।

তখন আমার মনে হলো, এই লেখা ও নকশা দিয়ে ফেরাউনের গোপন কবরের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আমি সেই পুরাতন কাগজপত্রের তাক দেখলাম। দেখে বুঝলাম, ওই তাকের কোন লেখা পড়ার বা বুঝার মত লোক আজ আর কেউ বেঁচে নেই। ফলে বিষয়টি নিয়ে আমি আর আগে বাড়িনি।'

'তুমি ঠিক চিন্তা করোনি গিয়াস!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'মিশরে এখনও এমন লোক বর্তমান আছে যারা পুরাতন লেখা ও নকশা পড়তে ও বুঝতে পারে। এসব কাগজপত্র ও নকশা চুরি যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। গুপ্তধনলোভী কোন ব্যক্তিই এই চুরি করেছে। চুরি যাওয়া কাগজের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই, তবে এই চোরদের ব্যাপারে আমার আগ্রহ রয়েছে। কে এই কাগজ চুরি করতে পারে অনুসন্ধান করো।'

'আমার আশংকা হচ্ছে, এই কাগজপত্রে অবশ্যই কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'আমি সম্মানিত গিয়াস বিলকিসের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি।

আমার কাছে এমন কিছু গোপন তথ্য আছে যার সুরাহা করতে পারছিলাম না আমি। মনে হয় এবার পারবো।'

উপস্থিত সবাই কান খাঁড়া করল, আলী বিন সুফিয়ান এরপর কি বলেন শোনার জন্য। তিনি বললেন, 'কস্তুরী নামে এই শহরে নামকরা এক নর্তকী আছে। ধনীদের জলসার প্রদীপ শিখা বলা হয় তাকে। আমার গোয়েন্দারা তার ওপর নজর রাখতো। পাঁচ ছয় দিন যাবৎ সে নিখোঁজ। একটি নর্তকীর শহর থেকে নিখোঁজ হওয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নয়। কিন্তু কস্তুরীর নিখোঁজ হওয়া আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। গুপ্তচররা বলেছে, তার কাছে কিছুদিন ধরে দু'জন সন্দেহভাজন অপরিচিত লোক আসা যাওয়া করছিল।

একদিন কস্তুরীর বাসা থেকে একটি পর্দানশীল মহিলাকে বের হতে দেখা গেল। সেই মহিলা সেই অচেনা বণিকের সাথে চলে গেল। এরপর থেকেই কস্তুরী নিখোঁজ। আমার মনে হয়, কস্তুরী তার লেবাস বদলে সেই লোকের সাথে শহর থেকে বের হয়ে গেছে। গোয়েন্দারা আরো খবর দিয়েছে, কয়েকটি ছোট ছোট দলকে উত্তর দিকে যেতে দেখা গেছে। তাদের চলাচল সন্দেহমূলক ছিল। আমার বিশ্বাস, এদের সাথে ঐ হারানো কাগজপত্রের গভীর সম্পর্ক আছে। আরও সন্দেহ হয়, ক্রুসেড কমাণ্ডো ও গোয়েন্দারা এর সাথে জড়িত। যাই হোক, আমি এর সঠিক তথ্য নিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, ভাল করে খোঁজখবর নাও।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'কিন্তু তোমরা ঐ গুপ্তধনের [illegible] অন্তর থেকে দূর করো। আমি জানি, জাতির কল্যাণ, উন্নতি এবং ইহুদী-খৃষ্টান সম্মিলিত বাহিনীর সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রচুর

অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমি কারো সাহায্য চাই না। সম্মানিত নূরুদ্দিন জঙ্গী আমাকে অর্থ সাহায্য দিতে চেয়েছেন। আমি তার সাহায্যও গ্রহণ করবো না। অযাচিত সাহায্য যদি মার পেটের ভাই থেকেও নেয়া হয় তবুও তা ব্যক্তিত্বের জন্য অপমানকর। পরিশ্রম করে আয় করা ও বিনাশ্রমের আয়ের মাঝে বিস্তর ফারাক। প্রথমটা মানুষকে পরিশ্রমী ও আত্মপ্রত্যয়ী বানায় আর দ্বিতীয় পথ মানুষকে অলস ও অকর্মন্য বানিয়ে ফেলে।

মিশরের মাটি অনুর্বর নয়। পরিশ্রম করলে এ মাটি তোমাকে নিরাশ করবে না। সরকারের কাছে জাতির যেমন চাওয়া পাওয়ার অধিকার আছে, তেমনি জাতির কাছেও সরকারের হক আছে। জাতি নিজ দায়িত্বে রক্ত পানি করে জমিতে চাষ করে বলেই সে জমি তাকে জোগায় বাঁচার ফসল, তেমনি দেশ ও জাতির সম্মান ও মর্যাদা অটুট রাখার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেললে এবং প্রয়োজনে বুকের রক্ত ঢাললেই কেবল সে দাবী করতে পারে সরকারের কাছে তার অধিকার ও নিরাপত্তা।

দেশ রেখে দেশের শাসকরা যদি গুপ্তধন সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে, তবে দেশ চলে যাবে দুশমনের হাতে আর তার জনগণ হবে দুশমনের গোলাম। দেশের জনগণের এমন দুর্গতি ডেকে আনার কোন অধিকার নেই আমার।'

o

যে গুপ্তধনের সন্ধানে সুলতান আইয়ুবীর এত আপত্তি সেই গুপ্তধনের খোঁজে তারই এক জেনারেলের পাঠানো পঞ্চাশজনের এক অভিযাত্রীদল পৌছে গিয়েছিল ফেরাউন

দ্বিতীয় রিম্যাসের কবরের কাছে। মার্ক লী, ইসমাইল, কস্তুরী ও এক খৃস্টান প্রথমে পৌঁছে যায় সেখানে। তাদের অন্যান্য সাথী, যারা পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করেছিল একই উদ্দেশ্যে, তারাও একে একে সেখানে এসে শামিল হতে লাগল। মধ্য রাতের একটু পরে মার্ক লী হাজিরা নিয়ে দেখল তার মিশনের পূর্ণ পঞ্চাশ জনই পৌঁছে গেছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

তারা এমন এক স্থানে মিলিত হলো, যার আশপাশ দিয়ে কোনদিন কোন পথিক চলাচল করেনি। স্থানটি দুর্গম এবং ভয়ংকর বলেই এদিকে আসে না কোন মরু-কাফেলা। এদিকে আসে না কখনো কোন টহল বাহিনী। সীমান্ত থেকে দূরে বলে এলাকাটা সীমান্ত প্রহরীদেরও আওতার বাইরে।

মার্ক লী রাতেই সকলকে পাহাড়ের এক ভয়ংকর খাঁজের মধ্যে এনে ঢুকালো যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পায়। যদিও এই সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ আশপাশে জনমানবের কোন চিহ্নও ছিল না, তবু হুশিয়ার মার্ক লী সদা সতর্কতার পরিচয় দিল এর মাধ্যমে। সবাই সেখানে পৌঁছে গেলে সে তাদের তাবু খাটিয়ে পরিপর্ণ বিশ্রাম নিতে বলল। বলল, 'যার যতক্ষণ ইচ্ছা শুয়ে থাকো, যতটা পারো বিশ্রাম নিয়ে নাও। কারণ এখান থেকে সবাইকে পায়ে হেঁটে এগুতে হবে।'

মার্ক লী সবাইকে আরাম করার অনুমতি দিয়ে কস্তুরীকে নিয়ে নিজের তাবুতে ফিরে গেল।

পরদিন ভোর। সূর্যের উত্তাপ গায়ে লাগার পর ঘুম থেকে জেগে উঠলো তারা।

এ অভিযানে কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র সঙ্গে আনতে

হবে মার্ক লী তাদের আগেই বলে দিয়েছিল। সে অনুযায়ী তারা সবাই রশি, কোদাল, শাবল আর অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তীর ধনুক ও তলোয়ার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

অভিযানে বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হলো মার্ক লী। সাথীদের নিয়ে বসল। তাদের বলল রাস্তায় কোথায় কি ধরনের সমস্যা হতে পারে। পথের প্রতিটি বিপদ ও বাঁধা সম্পর্কে অভিযাত্রীদের একটি ধারনা দিল মার্ক লী। বিশদভাবে বুঝিয়ে বললো দুর্গম অঞ্চলগুলোর কথা। খাদের মধ্যে ভঙ্গুর ও পাতলা প্রাচীরের কথা বললো তাদের। অভিযাত্রীরা দুর্গম অঞ্চলে পা রাখার আগেই এলাকাটা সম্পর্কে একটা ধারনা পেয়ে গেল এর ফলে।

সে তাদেরকে মানসিকভাবে আরো শক্ত করে গড়ে তোলার জন্য প্রাচীর থেকে পড়ে যাওয়া সাথীর গল্প শোনাল নির্বিকার চিত্তে। তাদেরকে বলল, মঞ্চের মত উপত্যকার কান্নার শব্দের কথা।

সবাই অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হলো। উটগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না বলে এগুলোর দেখাশুনা ও রাখালীর জন্য একজনকে রেখে যাওয়া প্রয়োজন। তার সাথে আপাতত কস্তুরীকেও এখানেই রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মার্ক লী।

মার্ক লীর আশা, ভিতরে যাওয়ার কোন একটা সহজ রাস্তা সে অবশ্যই পেয়ে যাবে। তখন কস্তুরীকে সে সেই পথে ভিতরে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম কোন পথের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে হবে। সে কস্তুরীর দেখাশোনার জন্য ইসমাইলকে রেখে গেল তার সাথে।

মার্ক লী ইসমাইলকে বললো, 'তুমি কস্তুরীর দেখাশোনা করার জন্য এখানেই থাকবে। তার আরাম আয়েশের প্রতি খেয়াল রাখবে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে এসে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যাব।'

মার্ক লী তার দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেলো। আগের পথ ধরেই পাহাড়ে প্রবেশ করল ওরা। তবে সরু রাস্তাটি উটের বদলে পার হলো পায়ে হেঁটে। আগের মত অনিশ্চিত অবস্থায় পা বাড়াতে হলো না তাদের। রাস্তাটি মার্ক লীর পূর্ব পরিচিত। আগে আগে নির্ভয়ে হেঁটে গেলো ও, পুরো বাহিনী তার পিছনে তাকে অনুসরণ করল।

যতই লোকগুলো এগিয়ে যেতে লাগলো ততই ভয় ক্রমশ: বাড়তে লাগল তাদের। তারা জানতো পথটি দুর্গম, কিন্তু এতটা বিরান ও ভয়াবহ অঞ্চল, বিকট পাহাড় ও টিলা তারা আগে কখনও দেখেনি। তারা যখন কান্না উপত্যকায় পৌঁছলো তখন সকলে আতংকিত চিত্তে এদিক ওদিকে দেখতে লাগলো। তারা বিশ্বাস করতে পারল না, এটা স্রেফ বাতাসের খেলা। তাদের মনে হলো, নি:সন্দেহে একদল মেয়ে বা তাদের প্রেতাত্মা এখানে কান্নাকাটি করছে।

কাফেলার সবাই এ অঞ্চলের গল্প শুনেছিল মার্ক লীর কাছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বলচিত্তের, তারা ভাবল, তাদেরকে সাহস জোগানোর জন্যই মার্ক লী এ গল্প শুনিয়েছে। এ ভাবনা মনে হতেই তারা আরো আতংকিত হয়ে পড়ল, কিন্তু পুরষ্কারের লোভে এই আতংক ও ভয় দাবিয়ে রাখল ওরা।

তবে এদের মধ্যে যারা ক্রুসেডের বেতনভুক গোয়েন্দা ও

কমাণ্ডো ছিল তারা ততটা ভীত হলো না। তারা তাদের অফিসার মার্ক লীর নির্দেশ তামিল করে ঠিক মতই এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেখাদেখি এবং পুরস্কারের লোভে বাকীরাও অগ্রসর হতে লাগল।

ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে কোন রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই সবাই এসে জড়ো হলো কান্না উপত্যকায়।

সবচে বিপদজনক এবং কঠিন অঞ্চল এখন তাদের সামনে। সেই গহীন খাদ ও তার মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ ভঙ্গুর দেয়াল এবার পার হতে হবে অভিযাত্রীদের। অতল গহীন খাদ ও চিকন দেয়াল দেখে দলের সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল।

মার্ক লী বেশ অসুবিধায় পড়ে গেলো ওদের নিয়ে। বলল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি এর আগেও এ দেয়াল পার হয়েছি। একটু সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে, এই যা।'

মার্ক লীই সবার আগে পা রাখলো সেই প্রাচীরে। তার পিছনে পা বাড়ালো তার এক কমাণ্ডো। তাদের দেখাদেখি সকলেই সেই দেয়াল পার হওয়ার জন্য এগিয়ে গেলো। একটু পর দেখা গেল, মার্ক লী দেয়াল পার হয়ে ওপারে চলে গেছে।

আরো কয়েকজন ওপারে পৌঁছে গেল। এখানো যারা দেয়ালে চড়ার সুযোগ পায়নি এ দৃশ্য দেখে তাদের সাহস বেড়ে গেল।

এমন সময় একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল, কেউ একজন দেয়াল থেকে ছিটকে পড়ে গেল অতল গহীন খাদের গভীরে। তার সাথে সাথে চিৎকারের ধ্বনিও নেমে গেল নিচের দিকে। এক সময় হারিয়ে গেল সে বিকট চিৎকারের ধ্বনি।

এমনিভাবে কিছুক্ষণ পরপর একটি করে চিৎকার ভেসে আসতে লাগল এবং তা খাদের গভীরে হারিয়েও গেল। মার্ক লী গুণে দেখল, এ পর্যন্ত পাঁচটি চিৎকার ভেসে এসেছে। দলের সবাই যখন ওপারে গিয়ে একত্রিত হলো তখন দেখা গেল, তাদের পাঁচজন সাথী নেই।

মার্ক লী তাদের বললো, 'সামনে আর এমন ভীতিকর পথ নেই। আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি এসে গেছি। আশা করছি, এই পথে আর তোমাদের ফিরে যেতে হবে না। একটি সহজ সরল পথ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো।'

ওখান থেকে আবার ওরা রওনা হলো। ওদের গন্তব্য নিম্নাঞ্চলের দিকে। পাথুরে পাহাড় অতিক্রমের পর মার্ক লী সেদিনের মত যাত্রা বিরতি করল। বলল, 'আজ দিনের মত এখানেই আমরা বিশ্রাম নেবো। এই ঢালু এলাকার শেষ প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে সবুজ প্রান্তর। ওখানেই আছে ফেরাউনের সম্পদের পাহারাদার রক্ষীরা। রাতে ওখানে হানা দেবো আমরা।'

রাত গভীর হলো। মার্ক লী তার বাহিনী নিয়ে রওনা হলো আবার। উপত্যকার এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পাথুরে মূর্তি। ওরা সেগুলো অতিক্রম করে প্রান্তরের শেষ মাথায় এসে পৌছলো। এখান থেকেই শুরু হয়েছে শ্যামল সবুজ গভীর নিম্নাঞ্চল। মার্ক লী সেখান থেকে একটু দূরে সবাইকে লুকিয়ে থাকতে বলে মাত্র দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে নিচে চলল। অন্যান্যদের বলে গেলো, 'তোমরা রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়। দু'জন পাহারায় থাকবে। আমরা ইঙ্গিত দিলে বাকীদের জাগিয়ে দেবে।'

নিচে তখন মৃত্যুর নিরবতা বিরাজ করছে। কোথাও কোন সামান্য আলোও দেখা যাচ্ছে না। তারা অনেক কষ্টে নিচে নেমে এল। তারপর এগিয়ে চলল সবুজ শ্যামল গ্রামের ভেতর। কিন্তু কিছু দূর এগুনোর পর কি হলো, মার্ক লী সঙ্গীদের বলল, 'না, আজ আর যাবো না, অভিযানের আগে দিনের বেলায় এলকাটা আরেকবার দেখে নিতে চাই।'

০০

কস্তুরী পেশাদার নর্তকী, সব সময় আমোদ প্রমোদ ও মজলিশী মেজাজে থাকায় অভ্যস্থ। শরাব পান, আড্ডা দেয়া ও পানির মত টাকা খরচ করে সময় কাটানো তার অভ্যাস। মার্ক লীরা চলে যাওয়ায় সে বলতে গেলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল এই ভয়ানক নির্জনতায় মার্ক লী তাকে এমন একটি লোকের সাথে রেখে গেল যাকে সে চেনে না।

মশহুর নর্তকী হিসাবে অনেকের মত ইসমাইলও তাকে চিনতো, কিন্তু সে ইসমাইলকে চিনতো না বা তার সম্পর্কে তার কোন ধারনাও ছিল না। ইসমাইল অপরাধ জগতের লোক হলেও তার চেহারায় তার ছাপ ছিল না। তার চেহারা ছিল সুশ্রী ও সুন্দর। আচরণ ছিল ভদ্র ও মার্জিত। স্বাস্থ্য ছিল সুঠাম ও সুগঠিত। তাই অপরাধ জগতের লোক হওয়ার পরও বাইরে থেকে তাকে অভিজাত ঘরের সম্মানিত লোক বলে মনে হতো। ফলে কস্তুরী চেহারা দেখে লোকটার আসল পরিচয় জানতে পারল না।

ইসমাইল কস্তুরীর সঙ্গে কথা বলতে ইতস্ততঃ করছিল। সারাদিন সে কস্তুরীর ভালমন্দের খেয়াল রাখলেও একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখল। কস্তুরীর মনে হল লোকটা অতিশয়

ভদ্র। সন্ধ্যার পর সে কস্তুরীকে ভুনা মাংস গরম করে দিল। খাওয়ার পর উৎকৃষ্ট শরাব দিল পান করতে। বলল, 'পানাহারের পর শুয়ে পড়ুন। যদি কোন প্রয়োজন হয় তাবুর মধ্য থেকে ডাক দিলেই আপনি আমাকে হাজির পাবেন।'

ইসমাইল বাইরে বেরিয়ে গেল। কস্তুরী খাওয়ার পর শরাবও পান করল, কিন্তু শোয়ার পর কিছুতেই তার ঘুম এল না। নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা তাকে ভীষণ রকম অস্থির করে তুললো।

কস্তুরী তার সৌন্দর্য ও অভিনয় দক্ষতা নিয়ে গর্ব অনুভব করতো। নৃত্যপটিয়সী হিসাবে লোকজন তার প্রশংসা করলে অহংকারে ফুলে উঠত তার বুক। সে দেখেছে, পুরুষমাত্রই তার চারপাশে ঘুর ঘুর করে আনন্দ পায়। সবাই তার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। বিশেষ করে অভিজাত ঘরের লোকদের কাছে তার কদরই আলাদা। ফলে তার ধারণা ছিল, ইসমাইলও সে রকম কিছু চেষ্টা করবে। এই গর্ব ও অহংকার নিয়েই সে অপেক্ষা করছিল ইসমাইলের চাটুকারিতার। কিন্তু ইসমাইল তার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি দেখে কস্তুরীর অহমে আঘাত লাগল।

শুয়ে শুয়ে এ নিয়েই চিন্তা করছিল সে, কিন্তু এ চিন্তার কোন শেষ ছিল না। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরও যখন কস্তুরীর কিছুতেই ঘুম এল না তখন সে তাবু ছেড়ে বাইরে এল এবং ইসমাইলের তাবুতে এসে দেখল, সেও তখনো ঘুমায়নি। কস্তুরীর আগমনে ইসমাইল উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'এই নিশুতি রাতে নির্জন প্রান্তরে একটা মেয়ে একা একা থাকতে পারে বুঝি! তার ভয় লাগে না?' সে তার কাছে বসে

পড়ে বললো, 'তুমি মনে হয় মুসলমান?'

'কি ব্যাপার! ধর্ম নিয়ে আবার মেতে উঠলে কেন?' ইসমাইল উত্তর দিল, 'তোমার আগ্রহ তো থাকার কথা শুধু অর্থের সাথে, সম্পদের সাথে, কোন ধর্মের সাথে নয়। আমার নাম ইসমাইল, তবে এখন আর আমার কোন ধর্ম নেই।'

কস্তুরী হেসে একটু বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু কোন্ ইসমাইল তুমি? আহমদ দারবীশের বিশেষ পছন্দের কেউ?' সে প্রশ্ন করলো, 'এই লোকটি কে, যে এ দলের নেতৃত্ব করছে? আমাকে সে তার নাম সুলায়মান সিকান্দার বলেছে, কিন্তু তাকে আমার মুসলমান বলে মনে হয় না।'

'তোমার সন্দেহ অমূলক নয়, লোকটি আসলেই মুসলমান নয়।'

'তাহলে বলো, লোকটা এ দেশেরও নয়!'

'হ্যাঁ, এ ব্যক্তি মিশরীয় নয়, সুদানীও নয় এবং তার প্রকৃত নাম সুলায়মান সিকান্দারও নয়।'

'তবে সে কে?' কস্তুরী প্রশ্ন করলো, 'তার আসল নাম কি? কোথাকার লোক?'

'আমি তার নাম ও পরিচয় তোমাকে বলতে পারবো না।' ইসমাইল বললো, 'এই গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আমি মূল্য পাই। তোমার তো লোকটি কে, এ নিয়ে কোন আগ্রহ থাকার কথা নয়? তুমি তোমার দাবী মত মূল্য পেয়েই তাকে আনন্দ দান করতে এসেছো। আর এটাই তোমার পেশা। সে তোমাকে গুপ্তধনের কিছু অংশ দেয়ার অঙ্গীকার করে থাকলে হয়তো তাও পেয়ে যাবে। কিন্তু এ জন্য তার পরিচয় জানা তোমার জন্য জরুরী নয়।'

'গুপ্তধন! সে তো আমার পাওনা!' কস্তুরী বললো, 'সে আমাকে যে মূল্য দিয়েছে, সে মূল্য এই ভয়াবহ মরু নির্জনে আসার জন্য অতি নগন্য। আমি তো গুপ্তধনের অংশ নিতেই তার সঙ্গে এসেছি!'

'তুমি কি মনে করো, যে গুপ্তধন লাভের আশায় তুমি এখানে এসেছো, সেই কাংখিত গুপ্তধন এত সহজেই পাওয়া যাবে? আর তা পাওয়া গেলে তার অংশ সে তোমাকেও দান করবে?' ইসমাইল প্রশ্ন করলো।

'কেন, তোমার এতে সন্দেহ আছে? মনে রেখো, আমি এমন মূল্যবান এক মেয়ে, লোকেরা যাকে গুপ্তধনের মূল্য দিয়েও কিনতে আগ্রহী।' কস্তুরী একটু অহংকারের স্বরেই বললো, 'এই লোক আমার কি মূল্য আদায় করবে! আমি এমন সব আমীরজাদা, শাহজাদাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখি, সে তুলনায় এ তো কিছুই নয়।'

'সে আর কত দিন?' ইসমাইল হেসে বললো, 'খুব বেশী হলে আর দু' বছর, চার বছর! তারপর তোমার কানাকড়ি মূল্যও থাকবে না। তুমি পাগলিনীর মত অলিতে গলিতে ছুটে বেড়ালেও কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। যার কাছে গুপ্তধন আছে, তার কাছ থেকে এক কস্তুরী গেলে দশ কস্তুরী ছুটে আসবে। শোনো কস্তুরী, বেশী অহংকার করো না।'

'কেন করবো না?' কস্তুরী বললো, 'এই লোক আমার রূপের যাদুতে এমন ফেঁসে গেছে যে, সে আমার কাছে কসম খেয়ে বলেছে, সে শুধু আমাকে পাওয়ার জন্যই গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়েছে। সে আমাকে আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে যাবে। সেখানে আমরা সাগর তীরে এক আলীশান মহল গড়বো।

তারপর আমি আর নর্তকী থাকবো না। এতেও কি তোমার সন্দেহ আছে?'

'তাতে আমার কোন সন্দেহ করার দরকার নেই। তবে যে আশ্বাস তোমাকে সে দিয়েছে তাতে মস্ত বড় এক ফাঁক রয়ে গেছে।' ইসমাইল বললো, 'আমাকেও উপযুক্ত মূল্য দিয়েই এখানে পাঠিয়েছেন আহমদ দারবীশ। তার কথাই আমার কাছে হুকুম। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি ওর সাথে যাও, তাই আমি এসেছি। এটাই আমার পেশা, আমি একজন ভাড়াটে খুনী। উপযুক্ত মূল্য পেলে আমি খুন করি, কিন্তু মিথ্যা কথা কখনও বলি না। আমি কখনও ধরা পড়ি না, কারণ আহমদ দারবীশ আমাকে বাঁচিয়ে দেন।

আমার মধ্যে আর একটি জিনিস আছে, সে হলো আমি নারীকে সম্মান দেই। আমি জানি না, কেন আমি এমনটি করি। নারী সে পর্দানশীল ভদ্র মহিলা হোক অথবা নর্তকী বা বিলাস সুন্দরী, আমি সকলকেই সম্মান করি। আমি কখনো কোন মেয়েকে ধোঁকা দেই না, তোমাকেও ধোঁকার মধ্যে রাখবো না। তোমাকে বলতে বাঁধা নেই, এ গুপ্তধন কারো মহল তৈরীর জন্য তালাশ করা হচ্ছে না, এর অর্থ মিশরের মূল উৎপাটনে ব্যবহার হবে। এ অর্থ দিয়ে এখানে খৃস্টীয় শাসন কায়েম করা হবে, মসজিদগুলোকে গীর্জা বানানো হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে এ গুপ্তধন দেশের বাইরে চলে যাবে। আমি জানি, মিশরের প্রতি তোমার কোন ভালবাসা বা দরদ নেই, আমারও নেই। আমরা দু'জনেই পেশাদার! পাপ আমাদের পেশা।

আর একবার শুনে নাও! তোমার সৌন্দর্য ও যৌবনের কাল আর অল্পই বাকী আছে, আর এই লোক তোমাকে সাথে নিয়ে

এসে শুধু আমোদ-স্ফুর্তি ও আরাম-আয়েশের জন্য। তার দৃষ্টিতে তুমি এক বিলাস কন্যা ছাড়া কিছু নও। যদি তোমার ওপর তার দয়া হয়, তবে দু'একটা হীরার টুকরো হয়তো দিতে পারে, কিন্তু কোন মহল তৈরী করবে না। সে যদি কোন মহল তৈরীই করে তবে তা তোমার জন্য নয়, সে এক নব যৌবনা রূপসীর জন্য। যে নব যৌবনা তুমি হতে পারবে না। তোমার চেহারায় এখনই ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। আজ হয়তো সে ভাঁজ সুন্দর লাগছে, কিন্তু আরেকটু গভীর হলে এ ভাঁজই তোমার সৌন্দর্যের চাহিদা শেষ করে দেবে।'

ইসমাইলের মুখে ছিল হাসি, বলার ভঙ্গিতে ছিল আন্তরিকতার ছোঁয়া। সেখানে ধোঁকা বা মিথ্যার লেশ ছিল না। কস্তুরী কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে এমনভাবে সত্যকে তুলে ধরতে আগে কখনও দেখেনি। তার ধারণা ছিল, ইসমাইল তার পিছনে দৌড়াতে শুরু করবে। কিন্তু তার পরিবর্তে সে তার যৌবনের ভাটির টানের কথা কি অবলীলায় বলে দিল!

যে কস্তুরী তার সৌন্দর্যের প্রশংসা শোনায় অভ্যস্থ, যে নিজেকে মিশরের রাণী কল্পনা করতো, ইসমাইলের কথায় তার সে স্বপ্নের প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ইসমাইলের বলার ভঙ্গিতে যে যুক্তি ও বাস্তবতা ছিল, কস্তুরী তা অস্বীকার করতে পারল না। বরং সে সত্য অবলোকন করে তার অন্তরের অতল তলে হাহাকারের সুর বেজে উঠল।

নিস্তব্ধ নিরব রাত থমকে থাকল না, সে ক্রমশঃই এগিয়ে চলল। কস্তুরীর চোখে ঘুম এলো না। ইসমাইলের সাথে কথা বলেই রাত পার করে দিতে চাইল কস্তুরী। সে তার এই মনোভাব গোপন রাখলো না। ইসমাইলও নিরাশ করলো না

তাকে।

কথা বলতে বলতেই শেষ রাতের দিকে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল কস্তুরী। যখন ঘুম ভাঙল, দেখল, ইসমাইলের তাবুতে শুয়ে আছে সে।

ইসমাইল তাবুর বাইরে কম্বল জড়িয়ে ঘুমিয়েছিল। কস্তুরী তাকে ডেকে তুলে বললো, 'আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে দেখলাম, কেউ একজন আমাকে বলছে, 'সুলায়মান সিকান্দারের গুপ্তধনের চেয়ে ইসমাইলের কথা অনেক দামী।'

সে হাসতে লাগলো। তার সে হাসিতে নর্তকীর কৃত্রিম অভিনয় ছিল না, ছিল এক ছোট্ট খুকীর সরলতা।

০

সূর্য উদয় হতে এখনো কিছু সময় বাকি। মার্ক লী নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী তার লোকদের একটি নিরাপদ ও উপযুক্ত স্থানে লুকিয়ে রাখল। সকাল যখন ফর্সা হয়ে গেল, তখন তারা সেই গোপন জায়গা থেকে নিচে বিবস্ত্র নারী পুরুষকে চলাফেরা করতে দেখল। মার্ক লী তার দলের একজন সাহসী লোক নিয়ে নিচে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। সে তাকে বলল, 'এই ঢাল দিয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যাও।'

দলনেতার নির্দেশ পেয়ে লোকটি জংলীগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে গেল এবং সমতল ভূমিতে গিয়ে পৌঁছলো। মার্ক লী তাকে ইঙ্গিতে সবুজ গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিতে বলল। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র সে উঠে দাঁড়াল এবং গাছের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার জন্য হাঁটতে শুরু করলো।

এ সময় হঠাৎ করে তিন চারজন মানুষখেকো লোক তাকে দেখে ফেললো এবং তাকে ধরার জন্য দৌড়ে এলো। তারা

আনন্দে চিৎকার করছিল। তাদের মনে পড়ে গেল, কদিন আগেই এ রকম একটি শিকার তারা পেয়েছিল এবং সবাই খুব তৃপ্তির সাথে ভোজনপর্ব সমাধা করেছিল সে রাতে।

তারা যখন লোকটার কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরলো, তখন ওপর থেকে তাদেরকে তীরের নিশানা বানালো মার্ক লী। জংলী লোকদের চিৎকার ধ্বনি শুনে আরও দু'জন ছুটে এলো সেদিকে। তারাও তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

মার্ক লী উপরে এক পাথরের সাথে লম্বা রশি বাঁধতে বলল সঙ্গীদের। রশি বাঁধা হলে সবাইকে বললো, 'তোমরা একের পর এক রশি ধরে নিচে নেমে যাও।'

সবাই একে একে রশি বেয়ে নিচে নেমে গেল। মার্ক লী ওপর থেকে রশি খুলে নিচে ফেলে দিল এবং প্রথম জনের মত গড়িয়ে নিচে নেমে এল। তারপর সকলেই দল বেঁধে তলোয়ার উঁচিয়ে সামনের দিকে দৌড়ে গেল। কয়েকজন জংলী খালি হাতে অসুরের মত ছুটে এলো উদ্ধত তলোয়ারের সামনে, মুহূর্তে তাদের হত্যা করলো মার্ক লী ও তার বাহিনী। দূর থেকে আরো কিছু উলঙ্গ লোক ছুটে আসছিল তাদের সাহায্য করতে, কিন্তু তাদের নিহত হতে দেখে তারা ফিরে উর্ধশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

মাইলখানেক দীর্ঘ এ সবুজ উদ্যানটি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। জংলীরা যেদিকে ছুটে গেল মার্ক লীর বাহিনী এবার ছুটল সেদিকে। পলাতক লোকদের ধাওয়া করে তাদের তাড়িয়ে বেড়াতে চায় মার্ক লী। দেখতে চায় এখান থেকে বোরোনোর কোন গোপন পথে তারা প্রবেশ করে কি না।

জংলীদের চিৎকার ও ডাকাডাকির স্বর লক্ষ্য করে তাদের

পিছু ধাওয়া করছে মার্ক লীরা। মার্ক লীর সামনে ছুটছে দু'জন জংলী। সে তাদের অনুসরণ করে ছুটলো ওদের পিছু পিছু। কিছু দূর যেতেই তাদের সাথে শামিল হলো আরো একজন। মার্ক লীর সামনে এখন দু'জন নয়, তিনজন জংলী ছুটে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে জংলী তিনজন সবুজ উদ্যানের এক প্রান্তে এসে পৌঁছল এবং তিনজনই পড়িমরি করে এক পাহাড়ী উপত্যকায় উঠতে শুরু করলো।

মার্ক লী কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে তাদের পেছন পেছন দৌড়াচ্ছিল। তিনজনই ছোট্ট উপত্যকাটি পেরিয়ে অপর দিকে নেমে গেল। মার্ক লী অনুসরণ করল তাদের। উপত্যকার চূড়ায় উঠতেই তার নজরে পড়ল অন্য দিকে একটি কালো পাহাড়ী অঞ্চল। সেখানে একটি পর্বত গহ্বরের মুখ ছিল, যার মধ্যে মাথা নত করে ঢুকে যাওয়া যেত। মার্ক লীর চোখের সামনে লোক তিনজন সেই পর্বত গহ্বরে প্রবেশ করল এবং তার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। মার্ক লী তলোয়ার হাতে সেই পর্বত গহ্বরের মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

ভিতর দিকে গহ্বর ক্রমশ: প্রশস্ত মনে হলো। মার্ক লী কালবিলম্ব না করে সেই গহ্বরে ঢুকে গেল। তার কানে এল জংলীদের দৌড়ানোর শব্দ। সেই শব্দ লক্ষ্য করে সাবধানে এগুতে শুরু করল মার্ক লী। এটা কোন প্রাকৃতিক সুড়ং নাকি ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যাপ্স মরার আগে এটা বানিয়েছিল স্পষ্ট বুঝা গেল না।

সুড়ঙ্গের পথ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাঁকের কাছে তা ঘুটঘুটে আঁধারের রূপ নিল। এভাবে কয়েকটি বাঁক পেরিয়ে আসার পর সামনের পথ কিছুটা আলোকিত মনে হল। মার্ক লী এখন আর

লোক তিনজনকে দেখতে পাচ্ছিল না, তবে তাদের কথা বলার স্বর শুনতে পাচ্ছিল। সে দ্রুত এগিয়ে গেল এবং সামনেই জংলী তিনজনকে গুহার গোলাকার মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখল।

জংলী তিনজনকে সে হত্যা করতে চাইল না, কারণ তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এদের বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

জংলী তিনজন গহ্বর থেকে বেরিয়ে গেলে মার্ক লীও গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল। তিনজনের মধ্যে একজন আর ছুটতে পারছিল না, লোকটি পথের মাঝেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মার্ক লী এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। দেখলো, লোকটি ঐ বুড়ো, যাকে সেদিন সাপের ফনা যুক্ত লাঠি হাতে দেখেছিল। গতবার তার সাথী যখন মানুষ খেকোদের হাতে নিহত হয় তখন এ বুড়োই ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

এ লোক খুবই বৃদ্ধ ছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না।

গহ্বরের বাইরে টিলা ও পাহাড়ী পথ। এ পথ গিয়ে মিশেছে অনতিদূরে বালি ও কাঁকর বিছানো এক উঁচু উপত্যকায়। উপত্যকার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটু আগের দেখা কালো পাহাড়টি।

মার্ক লী বৃদ্ধকে ধরে উঠালো এবং তার পালিয়ে যাওয়া দুই সঙ্গীকে ডেকে থামতে ইশারা করলো। সে বৃদ্ধকে বুঝাতে চেষ্টা করল, যেন তিনি তার দুই সঙ্গীকে ফিরে আসতে বলেন।

বৃদ্ধ তাদের ডাকলো। বৃদ্ধের ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল জংলী দু'জন। বৃদ্ধ তাদেরকে কাছে আসতে বললো। মার্ক লীকে সে মিশরীয় ভাষায় বললো, 'আমি তোমাদের ভাষা বলতে ও

বুঝতে পারি, আমাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ নেই।'

মার্ক লী মিশরী ভাষা ভালই বলতে ও বুঝতে পারতো। সে বৃদ্ধকে বললো, 'আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তোমার সঙ্গীদেরও হত্যা করব না। তোমরা শুধু বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখাও।'

'কেন, তোমরা কি এখান থেকে বের হতে পারছো না?' বৃদ্ধ প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ!' মার্ক লী উত্তর দিল, 'আমি তোমাদের রাজত্ব থেকে বের হয়ে যেতে চাই, কিন্তু পথ পাচ্ছি না।'

বৃদ্ধ তার দু'জন সাথীকে কিছু বললো, তারা দু'জন খুব ভয় পেয়ে গেল বৃদ্ধের কথা শুনে। বৃদ্ধ মার্ক লীকে বললো, 'এদের সাথে যাও, এরা তোমাকে বেরিয়ে যাওয়ার সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেবে।'

'তুমিও আমার সাথে চলো, এরা আমাকে ভুল পথ দেখাতে পারে।' মার্ক লী বৃদ্ধকে বললো।

বৃদ্ধ তার সাথে যেতে বাধ্য হল। দুই পাশে দু'টো টিলার মধ্য দিয়ে সরু একটি পথ ধরে চলতে লাগলো তারা। কিছু দূর গিয়ে নতুন একটি টিলার ওপরে চড়ল। ওই টিলা পার হয়ে আঁকাবাকা পেঁচানো রাস্তা ধরে কিছুদূর এগুতেই খোলা মরুভূমিতে পৌঁছে গেল।

এমন জায়গা দিয়ে মরুভূমিতে পৌঁছল ওরা, কেউ ধারণাও করতে পারবে না এখানে কোন রাস্তা আছে, যা ভিতরের রহস্যময় গোপন পৃথিবীতে নিয়ে যেতে পারে।

বৃদ্ধ বললো, 'তুমি এখন চলে যাও, নইলে খোদার অভিশাপে তুমি পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।'

মার্ক লী বললো, 'কিন্তু আমার সঙ্গীদের কি হবে? ওরা তো ভেতরে আটকা পড়ে আছে! ওদের ফেলে রেখে আমি কিছুতেই যেতে পারি না। ঠিক আছে, চলো, ভেতরে গিয়ে ওদের খুঁজে বের করি। তারপর ওদের নিয়ে চলে যাবো আমি।'

'আমরা ওদেরকেও তোমার মত বেরিয়ে যাওয়ার পথ চিনিয়ে দেবো। তুমি না হয় এখানেই অপেক্ষা করো, আমরা ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কিন্তু ওরা তোমাদেরকে সে সুযোগ নাও দিতে পারে। এই অভিশপ্ত পাহাড়ে আটকা পড়ে ওরা পাগল হয়ে গেছে। ওরা তোমাদের হত্যা করে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারচে আমাকে নিয়ে চলো, তাতেই তোমাদের লাভ হবে।'

অগত্যা তাকে সঙ্গে নিয়ে উলঙ্গ তিন জংলী আবার সেই পথে ফিরে চলল। ফেরার পথে মার্ক লী রাস্তার প্রতিটি বাঁক ও চড়াই উতরাই ভালমত দেখে নিল। আবার ওরা গর্তের মুখে এসে পৌঁছল এবং গুহাপথে হেঁটে সেই ভয়ংকর সবুজ প্রান্তরে প্রবেশ করলো। বৃদ্ধ তাকে সেখানে নিয়ে গেল, যেখানে মার্ক লীর সঙ্গীকে তারা আগুনে ভুনে খেয়েছিল।

মার্ক লীর সাথীরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কয়েকজন জংলীর লাশ পড়ে থাকতে দেখল ওরা। শিশুদের লাশও ছিল তার মধ্যে।

বৃদ্ধ এমন গণহত্যা আগে আর কখনও দেখেনি। তার চেহারা কঠিন হয়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে সে খুব ধৈর্যের সাথে মার্ক লীকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই নিষ্পাপ শিশুদের তোমরা কেন হত্যা করলে?'

'তোমরা আমার সাথীকে আগুনে পুড়িয়ে খেয়েছিলে!' মার্ক লী জিজ্ঞেস করলো, 'সে তোমাদের কি ক্ষতি করেছিল?'

'সে পাপ-দুনিয়ার লোক ছিল।' বৃদ্ধ বললো, 'সে আমাদের পবিত্র ভূমিতে এসে এখানকার মাটিকে নষ্ট ও নাপাক করেছিল।'

'তোমরা এখানে কেন থাকো?' মার্ক লী জিজ্ঞেস করলো, 'ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যাসের কবর পাহারা দেয়ার জন্য?'

'আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।' বৃদ্ধ বললো।

মার্ক লী তার লোকদের বলল, 'এদের নারীদের ধরে নিয়ে এসো।'

আক্রমণের আগেই সে সবাইকে বলে দিয়েছিল, তারা যেন কোন নারীকে হত্যা না করে এবং তাদের লাঞ্ছিতও না করে। তাদেরকে শুধু নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে রাখে।

মার্ক লীর সাথীরা দশ বারোজন নারীকে নিয়ে এলো সেখানে। তাদের মধ্যে দু তিনজন বৃদ্ধা আর সব যুবতী। কিশোরী ও শিশু বালিকাও ছিল। এরা সবাই ছিল বস্ত্রহীন উলঙ্গ। কিন্তু এ জন্য কারো মধ্যে কোন সঙ্কোচ ছিল না। তাদের গায়ের রঙ গমের মত উজ্জ্বল ফর্সা! শরীরের গঠন সুঠাম সুডৌল, মুখের আকৃতি সুশ্রী ও সুন্দর! মাথার চুল তাদের কোমর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। মেদহীন নিটোল অবয়বগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মার্ক লী!

'তোমরা কি চাও, তোমাদের নারীদেরকে তোমাদের সামনেই অপমানিত ও হত্যা করি?' মার্ক লী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো।

'তার আগে কি তুমি আমাকে হত্যা করবে না?' বৃদ্ধ

বললো।

'না!' মার্ক লীর সোজা উত্তর।

'শোন পাপিষ্ঠরা!' বৃদ্ধ বললো, 'তোমাদের নারীরা কাপড়ের আবরণে দেহ ঢেকে রাখে, কিন্তু মনের ওপর কোন আবরণ দেয় না। পর্দার মধ্যে লুকিয়ে থেকেও তারা হয় নির্লজ্জ ও বেহায়া। তাদের নিয়ে তোমরা নাচের আসর বসাও, গানের জলসা করো আর হৃদয়কে করো কলুষিত। নারীদের দেখলেই তোমাদের চোখে জাগে কামের নেশা, ভোগের আগুন। নারীর জন্য তোমরা খুনোখুনি করো, রাজ্য ত্যাগ করো। নারী হয় তোমাদের ধ্বংসের কারণ।

কিন্তু আমাদের নারীরা উলঙ্গ থাকে তবে বেহায়াপনা করে না। কোন পুরুষ তার জন্য নির্ধারিত নারী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকের দিকে কামের নজরে তাকায় না। নারীরা আমাদের পবিত্রতা ও সৌভাগ্যের প্রতীক। তোমরা আমাদের খোদা রিম্যান্সের সব গুপ্তধন নিয়ে যাও কিন্তু আমার অনুরোধ, আমাদের বউ-বেটির গায়ে হাত দিও না।'

'আমি অঙ্গীকার করছি, তুমি আমাদেরকে সম্রাট রিম্যান্সের গুপ্তধন পাওয়ার রহস্য বলে দিলে আমরা তোমাদের কোন নারীর অসম্মান করবো না, তোমাদের কারো ওপর কোন অত্যাচারও করবো না। যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা গুপ্তধন নিয়ে এখান থেকে চলে যাবো, আর কোনদিন এ পথে পা বাড়াবো না।'

'ভালই বলেছো হে ডাকাত সর্দার! কিন্তু দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় কান দিতে নিষেধ আছে আমাদের আইনে। ডাকাতের কোন কথা বা অঙ্গীকারে বিশ্বাস করি না আমরা।'

বৃদ্ধের ঠোঁটে তিরস্কারের বিদ্রূপ, 'যার অন্তরে অর্থের লোভ আছে, সম্পদের মোহ আছে তেমন প্রতিটি মানুষকেই আমরা তস্কর বা ডাকাত মনে করি। এই লোভ ও মোহ তাকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বানায়। তোমাদের দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ এই তস্কর বা ডাকাত দলের। অর্থের জন্য যেখানে তোমরা নিজের স্ত্রী কন্যাদের ইজ্জত বিসর্জন দিতে পারো, বন্ধুকে খুন করতে পারো, নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারো সেখানে এই ওয়াদা বা অঙ্গীকারের কোন মূল্য নেই। তুমি সেই দুনিয়ার লোক, যেখানে অর্থের জন্য মানুষ নিজের ঈমান পর্যন্ত বিকিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে বেঈমানী করা সম্ভব নয়। ভয় বা লোভ কিছু দিয়েই তোমরা আমাদের কাবু করতে পারবে না। আমরা কিছুতেই তোমার অপকর্মের দোসর হবো না।'

'এটা অপকর্ম নয়, এ সম্পদ মিশরের। আমরা সরকারের কর্মকর্তা আহমদ দারবিশের নির্দেশে এ অভিযানে এসেছি।'

'শোন আমার অচেনা বন্ধু! তুমি মিশরী নও। তোমার চোখে সমুদ্রের লোনা পানির চমক রয়েছে। নীল নদের পানির চমক নয়। তোমার শরীর থেকে সমুদ্র পারের গন্ধ আসছে।'

'আমি কে সে পরিচয় নেয়ার দরকার নেই তোমার। আমি ফেরাউন রিম্যান্সের কবরের অনুসন্ধানে এসেছি। আমাকে সে কবর দেখিয়ে দাও।' মার্ক লী তার রূপ পাল্টে ফেলল, রাগত স্বরে বললো তাকে, 'নইলে তোমার চোখের সামনে এ নারীদের আমি লাঞ্ছিত করবো।'

'না, এ কাজ তুমি করতে যেয়ো না। এতে তোমার ক্ষতি হবে।'

'আমার লাভ ক্ষতি আমি বুঝবো। তুমি কবরের সন্ধান বলবে কি না বলো?'

'ঠিক আছে, কবরের সন্ধান আমি তোমাকে দেবো।' বৃদ্ধ বললো, 'কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে চাই, তুমি ওখানে গেলে জীবিত আর ফিরে আসতে পারবে না। এ কথা জানার পরও তুমি সেখানে যাবে কি না বলো।'

'তোমাদের লোকেরা কি ওখানে আমাকে হত্যা করার জন্য লুকিয়ে আছে?'

'না!' বৃদ্ধ বললো, 'তোমাদের হত্যা করার মত আমার কাছে আর কোন লোক নেই। তোমার লোকেরাই তোমাকে হত্যা করবে। এবং এটাও জেনে রেখো, তোমার লাশ এখান থেকে কেউ নিতে আসবে না।'

'কি আমার ভবিষ্যত বক্তারে!' মার্ক লী ব্যঙ্গ করে বললো, 'এতই যদি ভবিষ্যত জানো তবে নিজেদের বাঁচাতে পারলে না কেন?'

'না! আমি ভবিষ্যত বক্তা নই। তবে অভিজ্ঞতার যদি কোন দাম থাকে তাহলে আমার কথা তোমার বিশ্বাস করা উচিত। এ জীবনে এমন অনেক ঘটনা দেখেছি আমি, যে ঘটনাবলী মানুষের অন্তরদৃষ্টি খুলে দেয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু তোমার ঘাড়ে এসে বসে আছে।'

মার্ক লী হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, 'জংলী বুড়ো, আমার মৃত্যু একটু পরে দেখলেও চলবে। আগে বলো সে কবরটা কোথায়, যার সন্ধানে এই দুস্তর মরু পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আমি।'

'ঠিক আছে, চলো তাহলে!' বৃদ্ধ বললো, 'সেটা কাছেই

আছে, এসো আমার সঙ্গে।'

মার্ক লী বলল, 'একটু অপেক্ষা করো।'

বুড়োকে অপেক্ষা করতে বলে সে সঙ্গীদের দিকে ফিরল এবং একটু চিন্তা করে ওদের বললো, 'এই নারীদের কোন রকম অসম্মান করবে না। এই বৃদ্ধ ও তার সাথীদের প্রতি নজর রাখবে। যতটা সম্ভব এদের সঙ্গে গল্পগুজব করে বন্ধুত্ব করে নাও। আমি কস্তুরী ও ইসমাইলকে আনতে যাচ্ছি।'

সে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসার নতুন চেনা সোজা রাস্তায় যাত্রা করলো এবং গুহার ভেতর এসে প্রবেশ করলো।

০

গুহা অতিক্রম করে মার্ক লী বেরিয়ে এল বাইরে। চার পাশে ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, কস্তুরীদের সে কোন দিকে রেখে গিয়েছিল। তারপর আন্দাজের ওপর ভর করে হাঁটা দিল সে।

মাথার ওপর প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়াচ্ছে সুর্য। সে উত্তাপ মাথায় নিয়ে একাই হেঁটে চলেছে মার্ক লী। প্রায় মাইল দুই রাস্তা অতিক্রম করার পর সে জায়গাটা চিনতে পারল। ঠিক এখান থেকেই দলবল নিয়ে যাত্রা করেছিল সে। এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড়ের খাঁজে তাবুর দিকে এগিয়ে গেল।

ওখানে পৌঁছেই সে কস্তুরী ও ইসমাইলকে একই তাবুতে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখলো। তার চেহারার রঙ পাল্টে গেল। সে ধমকের স্বরে ইসমাইলকে বললো, 'আমি তোমাকে বলে গিয়েছিলাম, তুমি ওর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করে চলবে। তুমি কোন সাহসে ওর পাশে গিয়ে বসছো?'

'ওর কোন দোষ নেই।' বললো কস্তুরী, 'আমিই ওকে

ডেকে নিয়েছি। এই নিঃসঙ্গ নির্জন মরুভূমিতে একা একা বেশীক্ষণ থাকলে, যে কেউ পাগল হয়ে যাবে! একাকীত্ব অসহ্য হওয়ায় কথা বলার জন্য আমি নিজেই তাকে আমার কাছে ডেকে এনেছি।'

'তোমাকে এ সফরে সাথে এনেছি শুধু আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য।' মার্ক লী রাগের সাথে বললো, 'এ জন্য চাহিদামত তোমাকে আমি মূল্য দিয়েছি। সে মূল্য পরিশোধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি আর কারো সাথে মিশতে পারো না। তোমার ঘরে তুমি শত জন বাদী রাখলেও এখানে তুমি আমার দাসী।'

গত রাতে ইসমাইল তার সরল মনে মার্ক লী সম্পর্কে যে ধারন দিয়েছিল, মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে তার প্রমাণ পেল কস্তুরী। বিদায়ের আগে যে সব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সে তার মন জয় করতে চেষ্টা করেছিল, সে সব মনে পড়ে গেল তার। ছি! এই কি সেই মার্ক লী! এখনো গুপ্তধন পায়নি, তার আগেই অহমিকার মগডালে উঠে বসে আছে! ঘৃণায় রি রি করে উঠল তার মন।

কস্তুরী মর্মে মর্মে অনুভব করল, মার্ক লীর কাছে এখন সে একজন গ্রাহক ছাড়া আর কিছু নয়। আর তাই মার্ক লী তাকে দাসী বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারল। মুহূর্তে কস্তুরীর রাণী হবার স্বপ্ন খান খান হয়ে গেল।

তার জীবন খুব দীর্ঘ নয়, তবু এতটুকু জীবনেই সে বহু মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে। সে যে পরিমাণ লোকের সাথে মিশেছে একজন নারী একশো বছর বেঁচে থেকেও এত লোকের দেখা পায় না। তার এ অভিজ্ঞতাই তাকে দিয়েছে ভালো-মন্দ মানুষ চেনার এক অদ্ভুত ক্ষমতা।

ইসমাইল তাকে একবারও বলেনি, সে ভাল লোক। বরং সে অকপটে স্বীকার করেছে, সে একজন ভাড়াটে খুনী। অর্থের বিনিময়ে মানুষ খুন করা তার পেশা। এই অকপটতাই প্রমাণ করে মার্ক লীর চাইতে মানুষ হিসাবে সে বেশী নির্ভরযোগ্য।

এদিকে মার্ক লীকেও উপেক্ষা করতে পারছে না কস্তুরী। উপযুক্ত মূল্য দিয়েই মার্ক লী তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। সে টাকা এখনো তার ঘরেই পড়ে আছে। এ টাকা ফেরত না দিয়ে মার্ক লীর অবাধ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। গুপ্তধনের যে লোভ তাকে দেখানো হয়েছে মার্ক লী যদি তা না-ও দেয়, তবু এখন সে মার্ক লীরই সম্পত্তি। কস্তুরী তাই আর কথা বাড়ালো না, চুপ করে রইল।

ইসমাইলও এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, চুপচাপ দু'জনের কথা শুনছিল আর নিরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল মার্ক লীকে।

দু'জনই চুপ করলে সে উঠে মার্ক লীর বাহু ধরে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে আস্তে করে বললো, 'আহমদ দারবীশ মনে হয় তোমাকে আমার ব্যাপারে কিছুই বলেননি। আমার সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। কিন্তু আমি তোমাকে ভাল মতই জানি। তুমি আমার দেশের ও জাতির মূল কাটতে এসেছো। আমি এতবড় পাপী, ভাড়ার বিনিময়ে তোমার সাথে এসেছি। তার মানে এ নয় যে, আমি তোমাকে আমার বাদশা মানি। আমি আমার মূল্য ষোল আনা তো বুঝে নেবই, যদি গুপ্তধন উদ্ধার হয় তবে তার অংশও আদায় করে নেবো।'

'এসব কথা তুমি আমাকে নয়, আহমদ দারবীশের কাছেই বলবে।' মার্ক লী তাকে কমান্ডারের ভঙ্গিতে বললো, 'এখানে

তুমি আমার অধীনস্ত কর্মচারী। গুপ্তধন যা বের হবে সেগুলো আমার তহবিলেই জমা থাকবে। আমি সেগুলো যেখানে চাইব সেখানেই নিয়ে যাব, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

'শোন সুলায়মান সিকান্দার!' ইসমাইল আস্তে করে হেসে বললো, 'আমি জানি তুমি মার্ক লী! সুলায়মান সিকান্দার নও। আমি এক নাম করা অপরাধী তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, গোয়ার্তুমী করে তুমি আমাকে মিশরী মুসলান বানিয়ে দিয়ো না। আর তোমাকে আরও সাবধান করে দিচ্ছি, কোন মুসলমানের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ জেগে উঠলে সে যদি লাশও হয়ে যায় তবু তার জাতীয় চেতনাবোধ বিসর্জন দেয় না। কোনঠাসা হয়ে পড়লে সে সিংহের চেয়েও সাহসী হয়ে যায়। তোমার ভালোর জন্যই বলছি, আমাকে অপরাধী হয়েই থাকতে দাও, বাড়াবাড়ি করো না।'

মার্ক লী বুঝতে পারলো, এ লোক গভীর জলের মাছ। একে শত্রু বানিয়ে নেয়া ভালো নয়। সে ইসমাইলের কাঁধের ওপর হাত রেখে বন্ধুর মত হেসে উঠে বললো, 'তুমি অযথা ভুল ধারণা করছো, আমি চাই না, এক বিলাস সুন্দরী আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করুক। এ নারী ভয়ানক চালাক, সে আমাদের দু'জনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে গুপ্তধনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তুমি আমাকে আর শত্রু মনে করো না। আহমদ দারবীশ কি তোমাকে বলেনি, সে তোমার সম্পর্কে কি চিন্তা-ভাবনা করে রেখেছে?'

'তোমার কি বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত তুমি গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবে?'

'আরে পারবো কি! পেয়েই তো গেছি!' মার্ক লী উত্তরে দিল,

'আমি তোমাদের দু'জনকে সেখানেই নিয়ে যেতে এসেছি।'

ইসমাইল তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। কস্তুরীও তাকে দেখতে লাগল। তার চেহারায় ঘৃণা ও রাগের ভাব স্পষ্ট।

মার্ক লী তার লোককে ডাকলো, যাকে উটগুলোর দেখাশোনায় রেখে গিয়েছিল। সে তাকে বললো, 'উটগুলো একটা অপরটার সাথে বেঁধে নিয়ে এসো, তাবুও গুটিয়ে নাও।'

০

মার্ক লী তাদের সেখানে নিয়ে গেল, যেখানে ফেরাউনের গোপন কবরের পাশে অন্যরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

কস্তুরী কঠিন এই পাহাড়ের মাঝে এমন শস্য-শ্যামল উদ্যান ও মনোরম জায়গা দেখে খুবই বিস্মিত হলো। উঁচু এক পাহাড়ের তলদেশে ছোট ঝিলে টলমল করছে স্বচ্ছ পানি। পাহাড়ের বুক থেকে পানির ঝরনা ফুটে বেরুচ্ছে। সারি সারি খেজুর বৃক্ষের কচি পাতা দোল খাচ্ছে বাতাসে। কস্তুরী এই প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়লো।

সে ইসমাইলকে সাথে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। একটু এগুতেই তার চোখে পড়ল একটি ছোট শিশুর লাশ। শিশুটির সমস্ত শরীর রক্তে ভেজা।

কস্তুরী ভয়ে সিঁটিয়ে গেলো। আরেকটু এগিয়ে দেখল, সেখানে আরও দু'টো লাশ একসাথে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। লাশ দু'টি বড়দের। এদের বুকে এখনো বিঁধে আছে তীর।

সে ইসমাইলকে সাথে নিয়ে এক খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকেই সে দেখতে পেল এক বিবস্ত্র বৃদ্ধকে সাথে নিয়ে মার্ক লী এক পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে।

এখানে সে আরও কিছু লাশ দেখতে পেল। তার মধ্যে পাঁচ ছ'টি শিশুদের। লাশগুলোর খোলা চোখে মুখে কষ্ট ও যন্ত্রণার চিহ্ন।

কস্তুরী ছিল আনন্দ ভুবনের বাসিন্দা। এমন বিভীষিকাময় দৃশ্য কোনদিন সে স্বপ্নেও দেখেনি। একটি ছোট শিশুর নিষ্পাপ ফুটফুটে লাশ দেখে কস্তুরীর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

মার্কেলীর তিন চার জন সঙ্গী কস্তুরীর কান্না শুনে ছুটে এলো সেখানে। কস্তুরী মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, ইসমাইল তাকে ধরে ফেললো। মার্কলীর সঙ্গীদের বললো, 'লাশ দেখে ওর মাথা ঘুরে গেছে।'

একজন পানি আনার জন্য ছুটে গেল। কস্তুরী আস্তে আস্তে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক হয়ে এল। সে জিজ্ঞেস করলো, 'এদের কে হত্যা করেছে? কেন এই ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে?'

মার্কলীর এক সঙ্গী তাকে সব ঘটনা খুলে বললো। কস্তুরী ইসমাইলের দিকে তাকালো, তার চেহারা ফ্যাকাশে।

ইসমাইল বললো, 'আমাদের চেয়ে এ লোকগুলো কতই না ভালো ছিল! যাদের আমরা অসভ্য, উলঙ্গ ও মানুষ খেকো বলছি, এরা কতই না দায়িত্বশীল ও আমানতদার! এই গুপ্তধন রক্ষার জন্য এরা জীবন দিয়েছে, তবুও গোপনীয়তা প্রকাশ করেনি। যদি এরা ফেরাউনের কবর খুঁড়ে সব মালামাল ও ধনরত্ন উঠিয়ে নিয়ে যেতো, তবে কে তাদেরকে ধরতো? এরা ছিল আমানতদার, দায়িত্ববান ও সরল মানুষ। আমরা নিজেদের সুসভ্য ও ভালো মানুষ বলি, অথচ এই খুনখারাবী ও ধ্বংসযজ্ঞ আমরাই চালিয়েছি। আমরা ডাকাত ও খুনী। এ সবই মার্কলীর

কাজ।'

'আমি এই গুপ্তধনের এক কপর্দকও গ্রহণ করবো না। এই নিষ্পাপ শিশু ও নিরপরাধ মানুষগুলোকে এমন নির্দয়ভাবে হত্যা করে আমরা যে অভিশাপ কুড়িয়েছি তার ভাগ আমি নেবো না।' কস্তুরী বললো, 'বলতে পারো, এই সরল সোজা নিরস্ত্র মানুষগুলোকে অযথা কেন হত্যা করা হলো?'

মার্ক লী বৃদ্ধের সঙ্গে উপত্যকার ওপারে চলে গেল। মার্ক লী দেখতে পেল তার সামনে ছোট্ট একটি পাহাড় চূড়া। তার গায়ে রোদ লেগে স্ফটিকের মত চমকাচ্ছে।

বৃদ্ধ তাকে বললো, 'উপরে চলো, সেখানে তোমাকে একটা মস্ত বড় পাথর দেখাবো, যেটি এখান থেকেও দেখা যায়। পাথর তো নয়, যেন ছোটখাট উপত্যকা। যদি তুমি ওটাকে সেখান থেকে সরাতে পারো, তবেই তুমি সেই দুনিয়ার দরজা দেখতে পাবে, যেখানে ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কফিন ও তার গুপ্তধন লুকোনো আছে। সেই উঠোনের মত পাথরকে সেখান থেকে আজ অবধি কেউ সরায়নি। পনেরো শ' বছরের মধ্যে এই পাথর কেউ স্পর্শও করেনি।

আমরা পনেরো শ' বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এই কবরের দেখাশোনা করে আসছি। আমি তোমাকে ফেরাউন রিম্যান্সের মৃত্যু ঘটনা এমনভাবে শোনাচ্ছি যেন তিনি এই কাল-পরশু মারা গেছেন। এসব ঘটনা আমার বাপ-দাদা শুনিয়ে গেছেন। বাপ-দাদাকে তার বাপ-দাদা শুনিয়েছেন। এমনিভাবে পনেরো শ' বছরের ইতিহাস আমাদের মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। যে ইতিহাস আমি আমার কবিলার লোকদের শুনিয়ে থাকি।'

'আমি তোমার সে কথা পরে শুনবো।' মার্ক লী অস্থির হয়ে

বললো, 'এখন উপরে চলো।'

তারা মস্ত উঠোনের মত সমতল পাথরের ওপর উঠে এল। বুড়ো বলল, 'এই তোমার কাঙ্খিত দরজা। এই পাথরের নিচেই লুকানো আছে সমস্ত ধনরত্ন।'

মার্ক লী বিশ্বাসই করতে পারছিল না, এটা একটা পাথর। তার মনে হচ্ছিল, সে কোন প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। যে ছাদ পাথর, বালি ও সিমেন্ট দিয়ে মজবুতভাবে তৈরী করা হয়েছে। মার্ক লী ছাদের চারদিক ঘুরে দেখল। সেখান থেকে নিচে নেমে এদিক-ওদিক ঘুরে দেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু নিরেট ছাদ ছাড়া একে আর কিছুই মনে হলো না। এমন কোন ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেল না যাতে একে পৃথক মনে হয়। কিভাবে এই পাথর সরানো যাবে এ কথা ভাবতে ভাবতে সে নিচে নেমে এলো।

'আমি জানি, এই পাথর এখানে আলাদাভাবে বসানো হয়েছে এ কথা তোমার বিশ্বাস হবে না। এখান থেকে দেখলে তা কারোরই বিশ্বাস হবে না। তবে তুমি যদি এর উল্টো পাশে যাও তাহলে দেখতে পাবে ছাদের একটি ঝুল বারান্দা আছে। পিছনের পাহাড়ের সাথে তা এমনভাবে মিলিত হয়ে আছে, যেখানে পাহাড় ও ছাদের অংশ পৃথক বোঝা যায়। এটা মানুষের হাতেরই তৈরী। মানুষের কর্মকুশলতা ও নিপূণতার এ এক অপূর্ব নিদর্শন। এটাকে এমনভাবে বানানো হয়েছে যাতে এটাকে প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলে মনে হয়।

ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্স নিজের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় এটা বানিয়েছিলেন। এর নিচে পাহাড়ের বুকের ভেতর যে দুনিয়া আবাদ রয়েছে সেটিও ফেরাউন রিম্যান্স তার

জীবদ্দশাতেই তৈরী করেছিলেন।

এই জগতকে বাইরের দুনিয়া থেকে কিয়ামত পর্যন্ত গোপন রাখার জন্য এই কৃত্রিম পাথরের ছাদ বানিয়েছিলেন। মরার আগ পর্যন্ত এর কারিগরদের তিনি কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন।

পরে ফেরাউনের মৃত্যুর পর তাঁর লাশের কফিন এখানে আনা হয়। প্রয়োজনীয় সামান ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়, ধনরত্ন রাখা হয়। তারপর তার কফিন ভেতরে রাখার পর কারিগরদের সবাইকে হত্যা করা হয়। ফেরাউনকে যারা খোদা মানতো এমন নিবেদিতপ্রাণ বারো জন যুবককে এনে এর পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। সে কালের মিশরের বারো জন সেরা সুন্দরী এনে সঙ্গিনী করে দেয়া হয় তাদের। সেদিন থেকেই তারা কবর ও সম্পদের পাহারা দেয়া শুরু করে। আজ তুমি যাদের হত্যা করেছো এবং এখনো আমরা যারা এখানে জীবিত আছি, ঐ বারো জন পুরুষ ও বারো জন নারীরই পরবর্তী বংশধর।

'এই বিশাল পাথর কেমন করে সরানো যাবে?' মার্ক লী চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

'এ পাথর সরাতে হবে এই চিন্তা করে এখানে তা রাখা হয়নি। তবে এটা যেহেতু প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়নি, মানুষই এখানে রেখেছে, তখন মানুষ চেষ্টা করে তা সরাতেও পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার দায়িত্ব আমি শেষ করেছি। গুপ্তধন উদ্ধারের অসম্ভব মিশন নিয়ে তুমি এতদূর ছুটে এসেছো, এখন এই দরজা খোলার দায়িত্ব তোমার। তোমাকেই এ পাথর সরানোর বুদ্ধি বের করতে হবে।' বলল বৃদ্ধ।

মার্ক লী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবরের মুখ মুক্ত করার জন্য

অধীর ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'এর সাথে রশি বেঁধে সবাই মিলে টানলে কেমন হয়?'

সে তাড়াতাড়ি তার লোকদের কাছে ছুটে গেল। তাদের ডেকে বলল, 'জলদি রশি আনো।'

তার লোকজন রশি নিয়ে ছুটে এল। তারপর তার নির্দেশ মত উপরের ছাদের এক প্রান্তের আংটার সাথে শক্ত করে বাঁধলো সেই মোটা রশি। একটা দুটো নয়, অনেকগুলো। এরপর সবাই নিচে নেমে এল।

মার্ক লী সবাইকে বললো, 'এসো এবার নিচে থেকে রশি ধরে জোরে টানতে থাকি।'

তার হুকুম পেয়ে চল্লিশ পঞ্চাশজন শক্তপোক্ত লোক সে রশি ধরে টানতে শুরু করল। কিন্তু তাতে পাথর বিন্দুমাত্র নড়লো না।

কিছুক্ষণ টানাটানির পর পাথরের নড়াচড়া বুঝতে না পেরে সে বলল, 'দাঁড়াও, আমি এই ছাদের ওপর উঠে দাঁড়াই। তাতে করে সামান্যতম নড়াচড়া হলেও বুঝতে পারবো।'

সবাইকে নিচে রেখে মার্ক লী এবার উপরে উঠে এল। সে উঠে আসার পর নিচ থেকে সবাই আবার 'হেইয়ো জোরে' বলে হেচকা টানে চেষ্টা করতে লাগল পাথরটি সরানোর। সকলের মিলিত টানে এক সময় মার্ক লীর মনে হলো, পাথরটি নড়ছে। সে চিৎকার করে বলল, 'সাবাস নওজোয়ান, পাথর নড়ছে। জোরে টানো, পারবে, তোমরা পারবে এ পাথর সরাতে। গুপ্তধন অবশ্যই তোমরা উদ্ধার করতে পারবে।' আনন্দে সে নাচছিল তখন।

যারা পাথর টানছিল তাদের মধ্যে নতুন জোশের জন্ম হল।

সেই উত্তেজনায় তারা এমন জোরে টান মারল যে, পাথরটি কেবল নড়লোই না, সামান্য একটু সরেও গেল। তাতে চুল পরিমান হলেও একটু ফাঁক তৈরী হলো। মনোবল বেড়ে গেল মার্ক লী ও তার সাথীদের। তারা সবাই আনন্দ ধ্বনি দিতে শুরু করলো এবং আরো জোরে টানতে থাকল। পাথরটি আরও একটু সরে এল।

টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো। এত টানাটানির পরও পাথরটি সামান্যই সরাতে পেরেছে তারা। কিন্তু সে জন্য কারো আফসোস নেই।

মার্ক লী নিচে নেমে এল এবং সবাইকে একটু আরাম ও বিশ্রামের জন্য ছুটি দিল।

সূর্য কালো পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। মার্ক লীর কাছে শরাবের বিশাল মজুত ছিল। সে সেই শরাবের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে বললো, 'তোমরা প্রাণ ভরে পান কর, আর ওই পাথর টেনে নামিয়ে আনার শক্তি সঞ্চয় করো।'

সবাই মদের বোতল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মার্ক লী আনন্দ উত্তেজনায় নাচছিল তখন। দীলদরিয়া বাদশার মত সে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলো, 'আমি আজ রাতে তোমাদেরকে দুই উট জবাই করে শাহী ভোজ দেবো।'

মদের প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলের সারাদিনের ক্লান্তি ও কষ্ট দূর হয়ে গেল। তাদের মনে ফিরে এলো শক্তি ও সজীবতা।

এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যেই সূর্য অস্ত গেল। পাহাড় থেকে একটু দূরে এক মাঠের মধ্যে কয়েকটি মশাল জ্বালিয়ে আনন্দ সাগরে ডুব দিল মার্ক লী ও তার সাথীরা। সন্ধ্যা রাত

পার হলো খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রামে।

রাতের দ্বিতীয় প্রহর।

মার্ক লী ডাকলো সবাইকে। এই রাতের আঁধারেও পাথর সরানোর কাজে নেমে পড়তে আগ্রহী সবাই। মার্ক লী বলল, 'ঠিক আছে চলো তাহলে।'

সকলে মিলে আর একবার জোরেশোরে রশি টানতে শুরু করলো। মার্ক লী উপরে দাঁড়িয়ে ছিল। মশালের টিম টিমে আলোয় কবরের মুখ থেকে অল্প অল্প করে পাথর সরে যেতে দেখল সবাই। তারা আরও জোরে নানা রকম উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি দিয়ে বিরতিহীনভাবে টানতে থাকলো পাথরটি। একটু পরে তারা দেখতে পেল পাথরটি হেলে পড়ছে।

উৎসাহ আরো বেড়ে গেল তাদের। মার্ক লী নেমে এল নিচে। সে একপাশে সরে গিয়ে অভিযাত্রীদের উৎসাহ দিতে লাগল। লোকগুলোও প্রচণ্ড আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে রশির প্রান্ত ধরে টেনে যেতে লাগল অব্যাহতভাবে।

সহসা বিকট আওয়াজ করে নিচের দিকে উল্টে পড়ল বিশাল ছাদ।

যেখানে দাঁড়িয়ে মার্ক লীর লোকেরা রশি টানছিল সে জায়গাটা ছিল সংকীর্ণ। তাদের পিছনে ছিল আরেকটি খাঁড়া পাহাড়। ওপর থেকে ছাদটি এমন গজবের মত নেমে এল তাদের মাথায়, নিচের লোকগুলো সরে যাওয়ারও সময় পেল না। তাদের তলে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল সব ক'জন মানুষ।

যে সব মশাল জ্বেলে রাখা হয়েছিল আশেপাশে, কিছু পড়ল তার নিচে, কিছু নিভে গেল বাতাসের ঝাপটায়। মার্ক লীর পায়ের নিচের পাহাড় দুনিয়া কাঁপানো ভূমিকম্পের মত কেঁপে

উঠল।

সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। ছাদ ও নিচের পাথুরে জমিনের ভীষণ সংঘর্ষে এমন তীব্র ও ভয়ংকর আওয়াজ হলো যে, স্তব্ধ হয়ে গেল মার্ক লী। সেই সংঘাতের তীব্রতা সইতে না পেরে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারালো সে।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে উঠে বসল। দূরে একটা মশাল টিমটিম করে জ্বলছিল তখনো, সে এগিয়ে গিয়ে সেই মশালটি তুলে আনল।

চারদিকে সুনসান নিরবতা। কোথাও কোন চিৎকার চেঁচামেচি নেই। নিস্তব্ধ নির্বাক ধ্বংসস্তুপের সামনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মার্ক লী। তারপর মশাল নিয়ে এগিয়ে গেল সেই ধ্বংসস্তুপের কাছে।

উল্টেপড়া ছাদের নিচ থেকে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ছাদের প্রান্ত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কারো হাত বেরিয়ে আছে, কারো পা বেরিয়ে আছে, কারো মাথার অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

এ সময় মার্ক লীর কানে হঠাৎ কয়েকজন মানুষের দৌড়ানোর শব্দ এল। মার্ক লী ভাবল, তাহলে কি কেউ কেউ বাঁচতে পেরেছে! ওরাই কি কোন সাহায্য নিয়ে ছুটে আসছে?

সে পায়ের আওয়াজ লক্ষ্য করে এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল কারা আসছে। ততোক্ষণে ছুটন্ত লোকগুলো টিলার কাছে পৌছে গেল। সে দেখতে পেল চার জন লোক ছুটে আসছে তার দিকে।

ওরা আরেকটু কাছে আসতেই সে চিনতে পারলো লোকগুলোকে। প্রথমেই আছে সেই বৃদ্ধ, যে তাকে গুপ্তধনের

গুহামুখের সন্ধান দিয়েছিল। তার পেছনে ইসমাইল ও কস্তুরী, সবশেষে তার সেই সাথী যে তাদের তাবু ও পশুর পাহারায় ছিল।

মার্ক লীর কাছে এসে থামল ওরা। সবাই খুঁব হাপাচ্ছে। কস্তুরীর দিকে তাকাল মার্ক লী। ভয়ে তার আপাদমস্তক থরথর করে কাঁপছিল। মার্ক লী নীরবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

চারজনই প্রথমে মার্ক লী ও পরে ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকাল। সকলেই হতবাক! কি বলবে, কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না!

প্রথমেই কথা বললো বৃদ্ধ, 'আমি তোমাকে সাবধান করেছিলাম, বলেছিলাম, তোমার চোখে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি। তুমি এ অসম্ভব অভিযানের সংকল্প ত্যাগ করে ফিরে যাও। আমার কথায় তুমি কান দাওনি। তুমি আমাকে বাধ্য করেছো, ফেরাউন রিম্যান্সের কবর ও গুপ্তধন উদ্ধারের গোপন রহস্য উদঘাটন করতে।

আমি জানতাম, এর পরিণতি কত মারাত্মক ও মর্মান্তিক। মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নেই তোমাদের। ভাগ্যগুণে এখনো বেঁচে আছো তুমি, কিন্তু আরেকটু এগুনোর চেষ্টা করলে খোদার গজব নামবে তোমার ওপরও। কেউ তোমাকে তার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। এখন বলো, তোমরা কি এখন ফিরে যাবে?'

'না!' মার্ক লী বললো, 'আমার এই সাথীরাও আমার সাথে থাকবে। এরাই হবে এখন আমার সহযাত্রী।' সে বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলো, 'আমার আর কোন সাথী কি বেঁচে নেই? কেউ কি পালাতে পারেনি?'

বৃদ্ধ বললো, 'তোমার চার সাথী আমার লোকদের সাথে পালিয়ে গেছে। আমার লোকেরা তাদেরকে বের হবার পথ দেখাবে না। তাদের শেষ পর্যন্ত পথে পথে ঠোকর খেয়ে বেড়াতে হবে ও দারুণ কষ্টে মরতে হবে। এরচে ওরা যদি পাথর চাপা পড়ে মারা যেতো তবেই ভাল করতো। এই মৃত্যু অনেক সহজ ছিল।

আজ রাতের মত বন্ধ রাখো এই কাজ। ভেতরে যদি যেতেই চাও, আগামীকাল ভোরে তোমাদেরকে আমি ভেতরে নিয়ে যাবো।'

০

মার্ক লীর উপরে এই দুর্ঘটনার কোন প্রভাব পড়লো না। সে বৃদ্ধকে নিয়ে তাবুতে ফিরল। ইসমাইল বৃদ্ধকে একটি চাদর দিল, সে সেই চাদর দিয়ে গা ঢেকে শুয়ে পড়ল। কস্তুরী তখনও নির্বাক। সে সেই নারীদেরও দেখেছে, যাদের মার্ক লী নিরাপত্তা বন্দী রেখেছিল। এখন তারা আর বন্দী নেই, অন্য কোথাও চলে গেছে।

'তোমরা আমাদের একজন সাথীকে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছিলে।' মার্ক লী জিজ্ঞেস করলো, 'এর আগেও তোমরা নরমাংস খেয়েছো? তার মত কতজনকে পেয়েছিলে তোমরা এরকম ভোজ দেয়ার জন্য?'

'যতজনকে আমরা ধরতে পেরেছি সবাইকে একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে।' বৃদ্ধ উত্তরে বললো, 'আমি বলতে পারবো না আমাদের পূর্বপুরুষরা কবে থেকে মানুষের মাংস খাওয়া শুরু করেছিল।'

'তোমরা তো ইচ্ছে করলে এসব গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে

যেতে পারতে! সভ্য সমাজে গিয়ে শাহানশাহের মত জীবনযাপন করতে পারতে। যাওনি কেন?'

'একটি ভবিষ্যতবাণী আমাদেরকে এ ধরনের অপকর্ম থেকে রক্ষা করেছে। ভবিষ্যতবাণীটি হলো, যে ব্যক্তি রিম্যান্সের কবর হেফাজত করবে, তাকে মরুভূমিও শীতল ছায়া দান করবে। আহার, পানি ও ছায়া থেকে কোনদিন বঞ্চিত হবে না তারা। দুনিয়ার লোভ-লালসায় জড়িয়ে পড়ার কোন দরকার হবে না তাদের। তাদের দেহে আবরণের দরকার হবে না। তাদের অন্তরে থাকবে অফুরন্ত ভালবাসা, পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থেকেই জীবন পার করে দেবে তারা। এই সুখী জীবন তারা ততদিন ভোগ করবে, যতদিন সোনা, রূপা ও মদের প্রতি তাদের আসক্তি না আসবে। যতদিন লোভ-লালসা তাদের আচ্ছন্ন না করবে। কারণ লোভই মানুষকে খুনী, ডাকাত, স্বার্থপর ও নীতিহীন বানিয়ে দেয়।'

'তুমি ঠিকই বলেছো, লোভই মানুষের সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংসের কারণ। সে কখনো ধন-সম্পদের লালসা করে, কখনো নারীর লালসা করে, কখনো মদ ও নেশায় আসক্ত হয়ে মানব সমাজে ডেকে আনে বিপর্যয়। তাদের কোন ধর্ম থাকে না। লোভ-লালসাই সমস্ত গন্ডগোলের মূল।' বলল ইসমাইল।

'এই ভবিষ্যতবাণী আমাদেরকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। ভবিষ্যতবাণীতে আরো বলা হয়েছিল, এমন সময় আসবে, যখন রিম্যান্সের রক্ষীরা মানুষের মাংস খাবে। প্রয়োজনে মানুষ শিকারের জন্য তারা বাইরেও যাবে। সভ্য সমাজের মানুষ যখন পশু স্বভাবে আক্রান্ত হবে তখন তারা মানুষকেও পশু জ্ঞান করবে এবং পশুর মতই তাদের শিকার

করে খাবে। যদি না খায় তবে তাদের বংশধারা শেষ হয়ে যাবে।' বলল বৃদ্ধ।

'তোমরা কি আজও ফেরাউনকে খোদা মান্য করো?' কস্তুরী প্রশ্ন করলো বৃদ্ধকে।

'মানুষ খুব দুর্বল প্রকৃতির! সে তাদের খোদা পরিবর্তন করে থাকে।' বৃদ্ধ বললো, 'আবার মানুষ কখনও নিজেই খোদা বনে যায়। এখন, এই সময়ে তোমরাই আমাদের খোদা! কারণ আমাদের জীবন ও আমাদের মেয়েদের ইজ্জত-সম্ভ্রম তোমাদের হাতে বন্দী। আমি তোমাদের কাছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংরক্ষিত গোপন রহস্য বলেছি তোমাদের প্রভুত্ব স্বীকার করে। মানুষ মাত্রেই মরণকে ভয় পায়, আমিও মৃত্যুর ভয়ে, নারীদের ইজ্জত হারানোর ভয়ে তোমাদের প্রভুত্ব মনে নিয়েছি।'

'ফেরাউনও আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তিনি সে যুগের মানুষদের ওপর ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের খোদা!' মানুষ বাধ্য হয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ! তুমিই আমাদের খোদা!' ক্ষুধা ও দারিদ্র মানুষকে সত্য থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করে ফেলে। তার ভেতরের স্নেহময়, প্রেমময় দরদী মানুষটি তখন মরে যায়।

মানুষের আসল খোদা মানুষকে 'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আশরাফুল মাখলুকাত' বলেছেন। কিন্তু যখন মানুষের পেটে আগুন জ্বলতে থাকে, তখন সে তার এই মহত্ত্বের কথা ভুলে যায়। সে সময় তার পেটের এই ক্ষুধা ও যন্ত্রণা যে দূর করতে পারে, মানুষ তার আনুগত্য কবুল করতে দ্বিধা করে না। মানুষের এই

দুর্বলতাকে সম্বল করে পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে সম্রাট ও রাজার।

এই আনুগত্যলোভী যারা সম্রাট বা রাজা হতে পারে না, তারা হয় ডাকাত, সন্ত্রাসী, মহাজন। তারা তাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য শুরু করে অত্যাচার। ছলে বলে কৌশলে মানুষকে করে তোলে অসহায়। এভাবেই সমাজে সৃষ্টি হয় শাসক ও শাসিত, জালিম ও মজলুম। এই ক্ষুধাই মানুষকে পাপের সাগরে ডুবিয়ে দেয়।' কস্তুরী তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরল বুড়োর সামনে।

বৃদ্ধ কস্তুরীর এই কথা মেনে নিল না। বলল, 'না, তোমার এই কথা ভুল। মানুষকে অমানুষ বানিয়েছে অর্থ ও সম্পদ। অমানুষ বানিয়েছে সোনা রূপা ও ধনরত্নের লোভ-লালসা।'

বৃদ্ধ এরই মধ্যে কস্তুরীর পরিচয় জেনে নিয়েছিল। সে জেনেছিল, কস্তুরী মিশরের রাজধানী কায়রোর নামকরা নর্তকী। বৃদ্ধ তার যুক্তি প্রমাণ করার জন্য কস্তুরীকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে? তুমি কি কর? এদের মধ্যে তুমি কি কারো স্ত্রী? কিংবা এদের কি কেউ তোমার আপন জন হয়?'

কস্তুরী তার এ প্রশ্নে খুবই বিব্রত অবস্থায় পড়ে গেল। সে এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে ভেতরে ভেতরে ঘেমে নেয়ে উঠলো। বৃদ্ধ তাকে নিরুত্তর দেখে বললো, 'তুমি তোমার অনুপম সৌন্দর্য এবং ফুটন্ত যৌবনের জন্য নিজেকে খোদা মনে করো। আর তোমাকে পাওয়ার আশায় যারা চেয়ে থাকে, তারাও তোমাকে খোদা মনে করে। আমাকে বন্য ও পশু মনে করো না। আমার কাছে কাপড় আছে, সে কাপড় পরে কখনো কখনো আমি কায়রোতেও যাই। তোমাদের সুসভ্য দুনিয়া ও সমাজকে চেয়ে চেয়ে দেখি। তারপরে আবার আমাদের নির্জন

ও সরল পৃথিবীতে ফিরে এসে কাপড় খুলে রাখি।

আমি তোমাদের সভ্য দুনিয়ায় পালকি গাড়ীতে রাজ কন্যাকে ভ্রমণ করতে দেখেছি। তোমারই মত রূপসী শাহজাদী দেখেছি। নাচগান করা নর্তকী ও গায়িকাকে দেখেছি। আর তাদের যারা নাচায় ও গান করায় তাদেরকেও দেখেছি।

আমি ফেরাউনের যুগের কথাও শুনেছি আর আজকের ফেরাউনদের কর্মকাণ্ডও দেখছি। আমি এ সকল লোকদের পরিণামও দেখেছি। তোমাদের পরিণাম এখন তোমাদের চোখে পড়ছে না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি।

তোমরা গুপ্তধন লাভের লালসায় এতগুলো নিরপরাধ লোককে হত্যা করলে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্য তোমাদের করতেই হবে। এর থেকে কখনও রেহাই পাবে না। যে ফেরাউনরা গরীবদের ওপর অত্যাচার করে নিজেরা খোদা হয়ে বসেছিল সে ফেরাউনরাও কেউ অমর হয়নি। তারাও আসল খোদার হুকুমে কবরে যেতে বাধ্য হয়েছে। তোমরাও কেউ বাঁচবে না, সময় তোমাদেরও কবরে নিয়ে যাবে।

তোমরা চাইলে, কাল সকালে আমি তোমাদেরকে গুপ্তধনের ভাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে তোমরা ফেরাউনদের পরিণাম স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তাঁরা যদি খোদাই হতো তবে তাদের এ পরিণাম হতো না। আসল খোদা তিনিই, যিনি এই সকল পরিণতি ঘটান! অথচ তাঁর কখনো এ রকম পরিণতি ঘটে না। তুমি জানতে চাচ্ছিলে, আমি এখনো ফেরাউনদের খোদা মানি কি না। যদি সঠিক ও সত্য খবর শুনতে চাও, তাহলে বলবো, আমি ঐ লোকদের কখনও খোদা মানি না, যারা পাহাড়ের নিচে হাড়-হাড্ডির স্তূপ হয়ে পড়ে

থাকে।

আমি ও আমার কবিলার লোকেরা দুনিয়ার লালসা থেকে বাঁচার জন্য নিজস্ব একটি মতবাদ ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে নিয়েছি। আমরা সেই বিশ্বাসেরই অনুসরণ করে থাকি।'

বৃদ্ধ থেমে থেমে ধীরস্থির কণ্ঠে কথা বলছিল। কস্তুরী তাকে দেখছিল আর বৃদ্ধের কথার মধ্যে তার জীবনের পরিণতি অনুসন্ধান করছিল। মার্ক লীর ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখায় তিরস্কারের আভাস প্রকাশ পাচ্ছিল। সে শরাব পান করছিল আর বৃদ্ধের কথা শুনছিল।

বৃদ্ধ থামলে সে বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'তুমি এখন তোমার নারীর কাছে চলে যাও। সকালে একটু আগেই উঠবে, আমাদের ভেতরে যেতে হবে।'

বৃদ্ধ চলে গেলে মার্ক লী কস্তুরীকে বললো, 'এসো, আমরাও শুয়ে পড়ি।'

'না, আমি তোমার সাথে যাবো না। আমি আজ আলাদা শোব।' কস্তুরী বললো।

মার্ক লী তার দিকে ঝুঁকে এলো। কস্তুরী পিছনে সরে গেল। মার্ক লী তাকে ধমক দিল। তখন ইসমাইল এসে তাদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। মার্ক লী তার চোখের দিকে তাকাল এবং সে চোখে দেখতে পেল ভয়ংকর খুনের নেশা জ্বলজ্বল করছে সেখানে।

মার্ক লী আর কথা না বাড়িয়ে পিছনে সরে গেল। সে যখন চলে গেল, কস্তুরী ইসমাইলের বুকে মাথা গুঁজে শিশুর মত কেঁদে উঠলো।

০

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মার্ক লী গুহায় প্রবেশের জন্য অস্থির হয়ে উঠল। সে বৃদ্ধকে ভোরেই চলে আসার জন্য বলেছিল, কিন্তু বেলা উঠার পরও বৃদ্ধের দেখা মিলল না। অস্থিরতা দমন করতে না পেরে সে বৃদ্ধকে খুঁজতে বেরোলো, কিন্তু আশেপাশে কোথাও বৃদ্ধকে দেখতে পেল না।

সে তখন বৃদ্ধকে ডাকতে শুরু করল, কিন্তু কোথাও থেকে কোন প্রতিউত্তর এল না।

আশঙ্কা ও অস্থিরতায় মার্ক লীর চেহারা বিভৎস রূপ ধারণ করলো। যেখানে সে জংলী নারী ও পুরুষদের বন্দী করে রেখেছিল সেখানে ছুটে গেল মার্ক লী। কিন্তু একি! মার্ক লী অবাক হয়ে দেখল, সেখানে কোন মানুষের চিহ্ন নেই। তারা সবাই পালিয়ে গেছে।

গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মার্ক লী তাদের খুঁজে বেড়ালো। অনেক ডাকাডাকি করল, কিন্তু সবই বৃথা চেষ্টা। লোকগুলো গ্রাম থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

এবার ভয় ঢুকলো দুঃসাহসী মার্ক লীর মনেও। লোকগুলোকে সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ওরা কি তাকে দেখছে? ওরা কি এমন কোন গোপন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে, যেখান থেকে ওরা ওকে দেখতে পাবে কিন্তু সে কাউকে দেখতে পাবে না? সে এখন একা, ওরা কি এর সুযোগ নিয়ে তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করবে? এক অনিশ্চিত যন্ত্রণা এসে ঘিরে ধরল তাকে।

হয়রান পেরেশান হয়ে সে আবার ফিরে এল তাবুর কাছে। নিজেকে সংযত ও সংহত করার চেষ্টা করল। মনে মনে ভাবল, ওদের আর আমার এখন কি দরকার? কবরের মুখ তো

খোলাই আছে। বৃদ্ধ না থাকলেও ভেতরে প্রবেশ করতে তো এখন আর কোন বাঁধা নেই।

তার আরো মনে হলো, তার কাছে যে নকশা আছে তাতে ভেতরে কোথায় কি আছে সব বর্ণনা করা আছে। এ নকশা দেখেই সে সব গুপ্তধন খুঁজে পেতে পারবে।

মার্ক লী ইসমাইল ও কস্তুরীকে বলল, 'চলো ভেতরে ঢুকে দেখি!'

ইসমাইল নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, 'চলো।'

অগত্যা কস্তুরীকেও তাদের সঙ্গী হতে হলো। তিনজন এক সঙ্গে উঠে এল উপত্যকায়। কবরের খোলা মুখের পাশে এসে দাঁড়াল তিনজন।

মার্ক লীই প্রথমে সে মুখ গহ্বর দিয়ে নিচে এলো। এটা একটা সুড়ং পথ। এ পথ কোথা দিয়ে কতদূর গেছে জানা নেই তার। ভেতরে বেশ অন্ধকার। মার্ক লী ওদের দিকে মুখ তুলে বলল, 'ভেতরে অন্ধকার। মশাল জ্বেলে তোমরাও চলে এসো। সবাই মিলে এক সঙ্গে এগিয়ে যাবো।'

মশাল জ্বেলে ইসমাইল এবং কস্তুরীও নেমে এল নিচে। তিনজন রওনা হলো সে সুড়ং পথ ধরে। কিছু দূর গিয়েই ওরা দেখতে পেল সুড়ং পথ বন্ধ।

মার্ক লীর কোমরে ঝুলছিল তলোয়ার, হাতে শাবল। সে শাবল দিয়ে আঘাত করলো বন্ধ পথে, ফাঁপা শব্দ হলো তাতে। মার্ক লী বলল, 'এটা একটা পাথরের দরজা। ওপাশটা ফাঁকা।'

পাথরের এ দরজা ভাঙার জন্য মার্ক লী ক্রমাগত আঘাত করতে লাগলো তার ওপর। এক পাশে সামান্য ফুটো সৃষ্টি হলো। ইসমাইল শুরু করল হাতুড়ী পেটা।

হাতুড়ী ও শাবলের সাহায্যে এক সময় পাথরের এ ছোট্ট দরজার এক পাশ ভেঙ্গে ফেললো ওরা। এবার অন্য পাশে মনযোগ দিল ওরা। অনেক পরিশ্রম ও কষ্টের পর দরোজা ভেঙে উল্টো দিকে পড়ে গেল।

দরজাটি ছিল নিরেট পাথরের এবং অসম্ভব ভারী। উল্টো দিকে ভেঙে পড়ার সাথে সাথে ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠলো পুরো গুহা।

ভেতর থেকে পনেরো ষোল শ' বছরের আটকে থাকা গ্যাস ও দুর্গন্ধ এসে ঝাপটা দিল ওদের নাকে মুখে। সে গন্ধের চাপ সইতে না পেরে ইসমাইল ও কস্তুরী পিছন সরে গেল। কিন্তু মার্কলী নাকে মুখে কাপড় জড়িয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে গ্যাস বেরিয়ে গেলে ওরা আবার মশাল নিয়ে এসে শামিল হলো মার্কলীর সাথে। কয়েক কদম অগ্রসর হওয়ার পর নিচে নামার একটি সিঁড়ি পড়ল ওদের সামনে। কোন কথা না বলে ঘাড় ফিরিয়ে চোখে নিচে নামার ইঙ্গিত করে মার্কলী পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির ওপরে মানুষের মাথার খুলি, হাড়-হাড্ডি ও কংকাল পড়ে থাকতে দেখলো। তার সাথে দেখলো বর্শা ও ঢাল তলোয়ার পড়ে আছে। বুঝা যায়, এগুলো প্রহরীদের হাড় ও কংকাল। জীবন্ত অবস্থায় এদেরকে পাহারায় রেখেই এই বিশাল কবরের মুখে পাথর চাপা দেয়া হয়েছিল।

সিঁড়ি ভেঙে অনেক নিচে নেমে এল ওরা। প্রবেশ করল চারদিকে নিরেট পাথরের দেয়াল ঘেরা এক বিশাল হলরুমে। হলরুমটি এমন সুন্দর ভাবে আস্তর ও পালিশ করা যে, এখনো ঝকঝক তকতক করছে। মনে হয়, গতকালই এতে নতুন

করে রঙ করা হয়েছে। কারিগররা কত দীর্ঘ সময় ও কাল ধরে পাথর কেটে এই বিশাল হলরুম বানিয়েছে ভাবতে গিয়ে কোন থৈ পেল না তারা।

মার্ক লী অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল হলরুমে রাখা একটি সুন্দর নৌকার দিকে। নৌকার সাথে মাল্লাদের বেঁধে রাখা হয়েছিল যাতে ওরা পালিয়ে যেতে না পারে। এখনো নৌকায় ওদের মাথার খুলি ও কংকাল পড়ে আছে।

ইসমাইল ও কস্তুরী বিস্মিত হয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এর কারুকাজ। হলরুমের একপাশে একটি অন্ধকার দরজা দেখতে পেল ওরা। ইসমাইল বলল, 'মার্ক লী, ওই যে দরজা!'

ওরা সেই অন্ধকার দরজা দিয়ে করিডোরে পা রাখল। করিডোরের মেঝে অসম্ভব মসৃন। করিডোর ধরে ওরা অন্য একটি কামরায় এসে পৌছল। এ কামরায় ওরা দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দর ও সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ী। গাড়ীর সামনে আটটি ঘোড়ার মাথার খুলি ও হাড় বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। গাড়ীর পালকি ও চালকের আসনেও মানুষের হাড় ও মাথার খুলি পড়েছিল।

ওরা এ কামরা অতিক্রম করে আরো সামনে বাড়ল। কিছুদূর এগুতেই একটি অপূর্ব সুন্দর কামরায় প্রবেশ করল ওরা। এটি সেই শিশমহল, যার দেয়াল কাঁচের মত মসৃণ ও স্বচ্ছ। এর ছাদ অনেক উঁচু, দেয়ালে শিল্পীদের আঁকা নানা রকম মনোমুগ্ধকর নকশা ও ছবি। একপাশে একটি মঞ্চ। মঞ্চে উঠার জন্য কয়েক ধাপ সিঁড়ি।

সেই সিঁড়ি বেয়ে ওরা মঞ্চের ওপর উঠে এল। মঞ্চের ওপর

শ্বেত পাথরের কারুকার্যময় বিশাল চেয়ার। দু'পাশের হাতলের মাথায় কেশর ফোলানো সিংহ মূর্তি। সেই বিশাল চেয়ারের ওপরে রিম্যান্সের মূর্তি বসানো, মূর্তিটিও মূল্যবান পাথরে গড়া।

তার পাশে একই রকম আরেকটি চেয়ার। চেয়ারটির কাছে এগিয়ে গেল ওরা। সেই চেয়ারে মাথার খুলি ও কংকাল পড়ে আছে।

কস্তুরী সেই মাথার খুলির দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো। দেখলো, সেই খুলির সাথে পড়ে আছে মহামূল্য মতির হার। হারে নীলা ও হীরার জ্যোতির্ময় পাথর বসানো। শুধু হার নয়, কানের বহুমূল্য গহনা এবং হাতের আংটিও পড়ে আছে চেয়ারে। মূল্যবান হীরা জহরত ও পান্নার পাথরগুলো চমকাচ্ছে তখনো।

মার্ক লী একটি হার হাত দিয়ে উঠালো। কয়েক হাজার বছর অতীত হওয়ার পরও হীরা ও মতির চমক বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। মশালের আলোয় হীরার দ্যুতি চমকাচ্ছিল।

মার্ক লী হারটি কস্তুরীর গলায় পরিয়ে দিতে গেল, কস্তুরী চিৎকার করে ইসমাইলের পিছনে গিয়ে লুকালো।

মার্ক লী হো হো করে হেসে উঠে বললো, 'আমি তো তোমাকে বলেই ছিলাম, আমি তোমাকে রানী ক্লিওপেট্রা বানাবো। ভয় পেয়ো না কস্তুরী! এসব হার সবই তোমার।'

'না।' কস্তুরী থরো থরো কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'না, আমি এই কংকাল ও খুলির মধ্যে আমার জীবনের পরিণাম দেখতে পাচ্ছি। এরাও তো আমার মতই জৌলুস ভরা জীবনের অধিকারী ছিল। কিন্তু কোথায় আজ সেই জৌলুস?

এটা তো সেই মিথ্যা খোদার দাবীদার অহংকারী এক বাদশাহর প্রেয়সীর কণ্ঠের মালা, যে খোদা আজ কংকাল হয়ে

এখানে পড়ে আছে শত শত বছর ধরে। আমি এদের পরিণাম থেকে শিক্ষা নিয়েছি, যাদেরকে তাদের অহংকার খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। আমিও আমার অন্তরের অহংকারী খোদাকে দেখতে পাচ্ছি।'

কস্তুরী ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের গুহায় প্রবেশের পর থেকেই ভয় পাচ্ছিল। এই কংকাল ও অলংকারাদি দেখার পর এমন মারাত্মকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, সে ইসমাইলের হাত ধরে তাকে টেনে হেঁচড়ে সেখান থেকে সরিয়ে নিতে চাইল। কী এক অসহ্য যন্ত্রণার অস্থিরতায় ছটফট করছিল সে।

টানতে টানতে কস্তুরী ইসমাইলকে অস্থির কণ্ঠে বলছিল, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো! চলো আমরা বেরিয়ে যাই! আমিও এই হাড়ের কংকাল ছাড়া আর কিছু নই!'

সে তার গলার বহুমূল্য হার টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল এবং চোখ বন্ধ করে একদিকে ছুঁড়ে মারল। হারটি কংকালের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

সে তার আঙ্গুলের অমূল্য আংটিও খুলে ফেলে দিল আর চিৎকার করতে থাকলো, 'আমি আমার পরিণতি দেখতে পাচ্ছি। আমি মিথ্যা খোদাদেরও দেখে নিয়েছি। আমার আর কিছু দেখার নেই, এখান থেকে আমার কিছু নেয়ারও নেই। চলো, আমাকে এখান থেকে বাইরে নিয়ে চলো। এই গুহায় আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি মরে যাবো। আমিও কংকাল হয়ে যাবো এখানে থাকলে। চলো, জলদি চলো, আমাকে বাইরে নিয়ে চলো।'

তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছিল সীমাহীন আকুতি ও কান্না।

সে ইসমাইলকে টানতে টানতে রুমের বাইরে বারান্দায় নিয়ে এল।

ইসমাইল কস্তুরীকে শান্তনা দিতে চাইল। বললো, 'তুমি শান্ত হও, কস্তুরী, স্বাভাবিক হও। আমরা চলে গেলে তো সবকিছু এই খৃস্টান একাই নিয়ে যাবে!'

কথা বলতে বলতে ইসমাইলের নজরে পড়ল সামনে আরেকটি দরজা। মশালটি ইসমাইলের হাতেই ছিল, সে কস্তুরীকে নিয়ে সেদিকে গেল এবং দরজা দিয়ে ঢুকে একটি খোলা কামরায় প্রবেশ করলো।

এ কামরার মাঝখানেও একটি মঞ্চ। মঞ্চের ওপরে শবদেহের কফিন রাখা। শবদেহের মুখটা খোলা।

এই সে ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যাসের শবদেহ, যার সামনে লোকেরা একদিন সিজদা করতো। তার লাশ সুগন্ধি মশলা ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান আরক দিয়ে এমন জমাটবদ্ধ করা ছিল যে আজ পনেরো শ' বছর পরও তার চেহারা অবিকল ও অবিকৃত ছিল।

দু'জনই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়েছিল সে লাশের দিকে। সাধারণত মানুষ মারা গেলে তার চোখ বন্ধ করে দেয়া হয়, কিন্তু ফেরাউনের চোখ দুটো ছিল খোলা। ইসমাইল সেই চেহারার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। কস্তুরীও। কারো মুখে কোন কথা নেই, যেন বোবা হয়ে গেছে তারা।

অনেকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে এল উভয়ের, একই সাথে একে অপরের দিকে তাকালো ওরা। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের, আবার ফেরাউনের চেহারায় ছুটে গেল ওদের দৃষ্টি। তারপর সে দৃষ্টি কফিন থেকে নেমে

কামরার এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। চারদিকে কংকালের অজস্র হাড়।

ওরা কামরার ভেতর ঢাকনাবদ্ধ কফিনের মত আরো কয়েকটি কারুকার্য খচিত বাক্স দেখতে পেল। একটি বাক্সের ঢাকনা খোলা। ইসমাইল এগিয়ে গেল বাক্সটির কাছে।

কস্তুরীও এগিয়ে উঁকি দিল তার ভেতর। উঁকি দিতেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল।

মশালের আলোয় দু'জনেই অবাক চোখে দেখলো, বাক্সটি হীরা-জহরত ও সোনার গহনায় পরিপূর্ণ। তার ওপর একটি মানুষের হাতের কংকাল পড়ে আছে, অপর হাতের কংকাল পড়ে আছে বাক্সের বাইরে। একজন মানুষের মাথার খুলি ও কঙ্কালের হাড়গুলোও পড়ে আছে বাক্সের পাশে।

'হায়রে মানুষ!' ইসমাইল বললো, 'এই লোকটি মরার আগেও গহনা ও হীরার টুকরো উঠাতে চেষ্টা করছিল। তার হয়তো আশা ছিল, এইসব ধনরত্ন নিয়ে সে এখান থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয়নি, তার আগেই তার নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং লোকটি এই গুপ্তধনের উপরেই পড়ে মারা যায়।'

কস্তুরী বলল, 'বৃদ্ধ ঠিকই বলেছিল, মানুষের দুশমন ক্ষুধা নয়, মানুষের দুশমন তার সীমাহীন লোভ লালসা।'

ইসমাইল সে বাক্সের উপর হাত রেখে বললো, 'কস্তুরী, তুমিও তো লোভে পড়েই এসেছ, কিছু এখান থেকে নিয়ে নাও।'

'না, ইসমাইল!' কস্তুরী তার হাত টেনে ধরে বললো, 'আমার লোভ মরে গেছে। আর সে কস্তুরীও মারা গেছে।'

ইসমাইল আবারও বাক্সের দিকে হাত বাড়ালো। কস্তুরী চিৎকার দিয়ে বললো, 'বাঁচো! ইসমাইল বাঁচো!'

তার এ চিৎকারে এমন কিছু ছিল যা মানুষের ইন্দ্রিয় রাজ্যে আঘাত হানে। ইসমাইল ছিল সদাসতর্ক ও উস্তাদ এক খুনী। কস্তুরীর আচমকা এ কানফাটা চিৎকার তাকে সতর্ক করে দিল। সেই চিৎকারের মর্ম বুঝতে পেরে সে মুহূর্তে একদিকে কাত হয়ে সরে পড়লো এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো, মার্ক লী উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে তাকে আক্রমণ করে বসেছে।

ইসমাইল আচমকা সরে পড়ায় মার্ক লীর তলোয়ারের আঘাত গিয়ে পড়লো বাক্সের ওপরে। মার্ক লী চিৎকার করে বলে উঠলো, 'এই গুপ্তধন আমার!'

ইসমাইলের কাছে ছিল খঞ্জর। খঞ্জর দিয়ে তলোয়ারের আঘাত ঠেকাতে পারবে না, জানে ইসমাইল।

সে দেখলো কস্তুরীর পাশেই একটি বর্শা পড়ে আছে। সে দ্রুত ছুটে গেল বর্শার পাশে এবং চকিতে তা উঠিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মার্ক লী ইসমাইলের ওপর আবার আঘাত হানার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে তলোয়ার তুলল, ইসমাইল বর্শা দিয়ে সে আঘাত ঠেকালো।

ইসমাইলের হাত থেকে মশাল পড়ে গিয়েছিল, কস্তুরী ছুটে গিয়ে মশাল তুলে নিল হাতে।

মার্ক লী আবারো ইসমাইলের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালালো, যেন সে গুপ্তধনের লোভে অন্ধ বা পাগল হয়ে গেছে।

ইসমাইল একদিকে সরে গিয়ে সে আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করল এবং মার্ক লীকে আর আঘাত করার সুযোগ না দিয়ে পাশ থেকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বর্শা দিয়ে আঘাত করল মার্ক

লীকে।

মার্ক লী পড়ে গেল। হাত থেকে তার ছিটকে গেল তলোয়ার। ইসমাইল মার্ক লীর শরীর থেকে বর্শা টেনে বের করে আবার আঘাত করলো। এ আঘাত মার্ক লীর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল মরণ চিৎকার। সে চিৎকার বদ্ধ ঘরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে যতক্ষণ বাজলো ততক্ষণ কস্তুরী ও ইসমাইল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চিৎকারের রেশ থামতেই সচকিত হলো ইসমাইল। কস্তুরীর হাত টেনে ধরে দৌড় দিল বাইরের দিকে।

গুপ্তধনের লোভে পড়ে কস্তুরী অংশ নিয়েছিল এই দুঃসাহসিক অভিযানে। এখন সেই গুপ্তধনের ভাণ্ডারে নিজের মূল্যবান কণ্ঠহার, হীরার আংটি, কানের দুল সব ফেলে দিয়ে ইসমাইলের সাথে ছুটছে এই অভিশপ্ত গুহা থেকে বের হওয়ার জন্য।

ছুটতে ছুটতে তারা গহ্বরের মুখে এসে পড়ল। ইসমাইল হাতের জ্বলন্ত মশাল ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুহা মুখের প্রান্ত ধরে লাফিয়ে উঠে এল উপরে। তারপর গুহা মুখের বাইরে শুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিল ভেতরে। কস্তুরী সে হাত আঁকড়ে ধরে পড়িমড়ি উঠে এল উপরে। এরপর তারা দু'জনই সেখানে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

কিছুটা সুস্থির হওয়ার পর তারা একজন অন্য জনের দিকে তাকাল। দু'জনের চোখেই কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কস্তুরী সেই চোখের দিকে তাকিয়ে ইসমাইলকে বললো, 'আমরা কোথায়? তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? বল তো আমি কে?'

'আমিও ঠিক তাই ভাবছি।' ইসমাইল বললো, 'আমার মনে হয় এইমাত্র আমি পৃথিবীতে এসেছি। আমার কোন অতীত নেই।'

'আমারও কোন অতীত নেই। যে কস্তুরী অর্থের লোভে মানুষের মনোরঞ্জন করতো ওই গুহার ভেতর আমি তাকে কবর দিয়ে এসেছি।'

'যে ইসমাইল অর্থের বিনিময়ে মানুষ খুন করতো আমিও একটু আগে তাকে কবর দিয়ে এসেছি মস্ত এক সম্রাটের পাশে।'

'হ্যাঁ, আমরা দু'জনই আমাদের সমস্ত অতীত, সমস্ত গোনাহ ও পাপ ওই গুহায় ফেলে এসেছি। সমস্ত লোভ ও অপরাধ প্রবণতাকে গলা টিপে হত্যা করে রেখে এসেছি ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কবরে।'

হ্যাঁ, ওরা সজ্ঞানে কবরে ফেলে এসেছিল সামান্য কিছু গহনাপত্র, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তাদের আজন্ম লালিত স্বপ্ন, বোধ ও বিশ্বাস ওই কবরে ফেলে এসেছিল চিরদিনের জন্য।

এই অদ্ভুত ও ভয়ংকর এলাকা থেকে বের হবার পথ তাদের জানাই ছিল। তারা সহজেই তাদের পরিচিত পথ ধরে বেরিয়ে এলো সেই অভিশপ্ত অঞ্চল থেকে।

বাইরে মাত্র কয়েকটি উট দাঁড়িয়ে ছিল। অন্য উটগুলো কোথায় গেছে জানার কোন চেষ্টা করল না ওরা। দু'জনে দু'টি উটের পিঠে উঠে কায়রোর দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

০

সে দিনই মধ্য রাতের একটু পর।

কস্তুরী ও ইসমাইলের কাছ থেকে অভিযানের বিস্ময়কর কাহিনী শুনছিলেন গিয়াস বিলকিস। সমস্ত কাহিনী বিস্তারিতভাবে মনযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি।

তাদের বক্তব্য শেষ হলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখন আমার কাছে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কথাই সঠিক মনে হচ্ছে। তিনি এই গুপ্তধন থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন আমাদের।'

কায়রো শহরের পুলিশ সুপার গিয়াস বিলকিস। ইসমাইল ও কস্তুরী সম্পর্কে ভাল করেই জানা ছিল তার।

এরা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে এসেছে তার কাছে। মরুভূমি থেকে ফিরে আহমদ দারবীশের কাছে যাওয়া বাদ দিয়ে ওরা গিয়াস বিলকিসের কাছে চলে এসেছে। তার কাছে পুরো কাহিনী বর্ণনা করে বললো, 'এই ঘটনার মূলে আছে সেনা অফিসার আহমদ দারবীশ। তারই ষড়যন্ত্রে ও যোগসূত্রে মার্ক লী এই অভিযানে বেরিয়েছিল। প্রকাশ্যে মার্ক লী অভিযান পরিচালনা করলেও নেপথ্যের নিয়ন্ত্রক ছিল আহমদ দারবীশ।

গিয়াস বিলকিস সঙ্গে সঙ্গে এই খবর জানালেন আলী বিন সুফিয়ানকে। আলী বিন সুফিয়ান খবর পাওয়ার সাথে সাথে ছুটে এলেন গিয়াস বিলকিসের কাছে। কস্তুরী ও ইসমাইলের কাছ থেকে নিজ কানে শুনলেন এই অভিযানের সমস্ত কাহিনী ও ঘটনা।

আহমদ দারবীশ কোন সাধারণ পদ মর্যাদার লোক ছিলেন না। তারা দু'জন রাতেই ছুটে গেলেন সুলতান আইয়ুবীর কাছে। সুলতানকে জানালেন আহমদ দারবীশের ষড়যন্ত্র ও অভিযানের কথা।

'সুলতান, এই মুহূর্তে তাকে গ্রেফতার করার অনুমতি চাই।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

সুলতান আইয়ুবী অনুমতি দিলেন। গিয়াস বিলকিস ও আলী বিন সুফিয়ান সেই অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এলেন আইয়ুবীর মহল থেকে।

আলীর কমাণ্ডো বাহিনী পুলিশের ছত্রছায়ায় সে রাতেই অতর্কিতে আহমদ দারবীশের বাড়ীতে হাঁনা দিল। গ্রেফতার করা হলো আহমদ দারবীশকে।

সমস্ত বাড়ীতে ব্যাপক তল্লাসী চালানো হলো। তল্লাশীর ফলে বেরিয়ে এল সেই সব নকশা ও কাগজপত্র, যা পুরাতন কাগজপত্রের ফাইল থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।

খুব সকালে আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলকিসের পরামর্শে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সেনাবাহিনীর একটি বড় দলকে 'মৃত্যু উপত্যকা' বলে পরিচিত সেই রহস্যময় এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন, যে ভয়ংকর মরু পাহাড়ের অভ্যন্তরে ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কবর ছিল।

রওনা হওয়ার সময় সুলতান আইয়ুবী বাহিনীর সালারকে বললেন, 'কবরের মুখ আগে যেমন ছিল ঠিক তেমন করে বন্ধ করে দেবে। কাউকে গুহার ভেতর যেতে দেবে না। ওখান থেকে গুপ্তধন আনা তো দূরের কথা, আমি চাই না কেউ সে ধনরত্ন চোখে দেখুক।'

ইসমাইল তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই পাহাড়ী উপত্যকায়। ভয়ংকর জটিল পথ ব্যবহারের কোন দরকার হলো না তাদের। বৃদ্ধের দেখানো সোজা সরল পথেই বাহিনী গিয়ে পৌছলো সবুজ উদ্যানে। বাহিনীর লোকদেরকে ইসমাইল

শোনালো এখানে দুদিন আগে কি লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল।

কবরের গুহামুখে পৌঁছলো সেনাবাহিনী। অবাক বিস্ময়ে তারা দেখল ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কবরের সুবিশাল গুহামুখ।

এই মুখ দিয়ে ঢুকে কিছু দূর অগ্রসর হলেই তারা দেখতে পাবে সম্রাটের মমি, তার বিপুল ধনরত্ন, যা পনেরো শ' বছর ধরে পড়ে আছে এই কঠিন শিলাদৃঢ় পাথরের অন্ধকার গুহার ভেতর। হাত বাড়ালেই ওরা এখন পেতে পারে অবিশ্বাস্য রত্নের বিশাল ভাণ্ডার। কারো মনের গহীনে তেমন কোন লোভ আদৌ জাগল কিনা বলা মুশকিল, তবে কেউ সে ধনরত্ন উদ্ধারের জন্য এগিয়ে গেল না।

সেনাবাহিনীর জওয়ানরা শিকল ও দড়ি বেঁধে টেনে সেই বিশাল ছাদের মত পাথর উপরে নিয়ে যথাস্থানে লাগিয়ে দিল। ফেরাউন দ্বিতীয় রিম্যান্সের কবর ও বিপুল ধনরত্ন আবার এই পৃথিবীর মানুষের চোখের আড়াল হয়ে গেল। তবে তার আগে নতুন করে আরেকজন পাপীর কাফনহীন লাশও অদৃশ্য হলো সেই গুহার ভেতর।

০

১১৭৪ খৃস্টাব্দ, মোতাবেক ৫৬১ হিজরী সাল।

সময়টা মুসলমানদের জন্য মোটেও অনুকূল ছিল না। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নানারকম দুঃসংবাদ পাচ্ছিলেন বিভিন্ন দিক থেকে। একদিন আলী বিন সুফিয়ান একটি সংবাদ শোনালো তাকে, 'আক্রাতে আমাদের একজন গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে এবং আরেক গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। যে এই সংবাদ

নিয়ে এসেছে সেও ওদের সাথেই ছিল। এই গোয়েন্দা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সংবাদ এনেছে।'

একজন গোয়েন্দার শাহাদাত ও অপরজনের গ্রেফতারীর খবর সুলতান আইয়ুবীকে অস্থির করে তুললো। আলী বিন সুফিয়ান বুঝতে পারলেন, এ খবরে সুলতান আইয়ুবী একটু বেশীই পেরেশান হয়ে পড়েছেন। নিহত গোয়েন্দা আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বাহিনীর একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সদস্য ছিল। আলী নিজেও তার মৃত্যুতে শোকাকুল ছিলেন, সুলতানের শোক দেখে তিনি আরো শোকার্ত হলেন। এই সদস্য সামরিক গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং এই তথ্যের সত্যতা নিরূপণে অতিশয় পারদর্শী ছিল।

গোয়েন্দা বিভাগের একজন দক্ষ ব্যক্তির শাহাদাতে সুলতান যে পরিমাণ পেরেশান হলেন, নিয়মিত বাহিনীর শত শত সৈন্যের শাহাদাতেও তিনি এতটা আফসোস করেন না। আলী দেখেছে, সব সময়ই অন্য কোন দেশে পাঠানো গোয়েন্দা কর্মীর শাহাদাতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান। এ ধরনের খবর পেলেই তাঁর চেহারা মলিন ও বিষণ্ন হয়ে যায়। এ ধরনের খবরে তিনি কতটা দুঃখ পান তা তাকে কেউ না দেখলে উপলব্ধি করতে পারবে না।

একজন গোয়েন্দার শাহাদাত ও অপর একজনের গ্রেফতারীর সংবাদে আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইয়ুবীর মুখে দু:খ ও বেদনার গভীর ছাপ দেখে বললেন, 'আমীরে মুহতারাম! আপনার চেহারা যখন বিষণ্ন হয়, তখন মনে হয় সমস্ত মুসলিম জাতটাই বিষণ্ন হয়ে পড়েছে। ইসলামের সম্মান ও গৌরব জীবনের কুরবানী চায়। একদিন আমাদের দু'জনেরও

শহীদ হতে হবে। আমাদের দু'টি গোয়েন্দার ক্ষতি হয়েছে, আমি আরও দু'জন গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিব, এই ধারা তো আর বন্ধ থাকবে না।'

'এই ধারা বন্ধ হয়ে যাবে আমার মনে এমন কোন সন্দেহ বা আশংকা নেই আলী।'

সুলতান আইয়ুবী বেদনার হাসি হেসে বললেন, 'কোন গোয়েন্দার শাহাদাতে আমার মনে একই সাথে দুটি চিন্তার জন্ম হয়। ভাবি, দ্বীনের এমন একজন মুজাহিদ আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেল, যে আমাদের ভাই হয়েও আমাদের কাছ থেকে ছিল বহু দূরে।

দ্বীনের জন্যই সে দূর দেশে পাড়ি জমিয়েছিল। দেশ থেকে দূরে, বিবি বাচ্চা থেকে দূরে, বোন-ভাই ও মা-বাবা থেকে দূরে।

সেই দূর বিজনে চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও সে তার দায়িত্বের কথা ভুলেনি। নিঃসঙ্গতার যাতনা সয়েছে, একাকীত্বের বেদনায় ভুগেছে, কিন্তু দায়িত্বে গাফলতি করেনি। আর এমন নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেছে যে, দায়িত্বের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত কুরবানী দিয়েছে।

অথচ এ জাতিতেই আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা কেবল একটু আরাম আয়েশে জীবন যাপন করার জন্য নিজের ঈমান বিক্রি করে দেয়। এসব বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকরা সামান্য বিলাসিতার জন্য শত্রুর ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে ইসলামের মূল কাটে। অনেকে না বুঝে, আবার কেউ কেউ জেনে বুঝেই ইসলামের ধ্বংস সাধনে শত্রুকে সহযোগিতা করে।'

'আপনি কি চান, সেনাবাহিনীর অফিসাররা এ ব্যাপারে

জনগণকে সচেতন করার কাজে নেমে পড়ুক?' আলী বিন সুফিয়ান বললো, 'অথবা আপনি নিজে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্রুসেডদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চান?

আমার মনে হয়, অনেকে ঝোঁকের বশে শত্রুদের সহযোগিতা করে। এতে যে দেশ ও জাতির কি মারাত্মক ক্ষতি হয় তা তারা বুঝতে পারে না। অনেক সময়, এতে যে শত্রুদের সহযোগিতা করা হয়, তাও তারা বুঝতে পারে না। বুঝাতে পারলে হয়ত অনেকেরই চিন্তায় পরিবর্তন আসবে এবং তারা এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবে।'

'না!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'যখন মানুষ তার ঈমান বিক্রি করতে চায়, তখন তার সামনে কোরআন রাখলেও সে একদিকে কুরআন রেখে দিয়ে তার কাজ করে যেতে থাকবে। যখন কারো সামনে অর্থ-সম্পদ, নারী ও শরাব রাখা হয় তখন কথার ফুলঝুরিতে মন ভরে না তাদের। যারা অর্থ-সম্পদ, নারী ও শরাবের নেশায় আচ্ছন্ন হয়, সদুপদেশ তাদের মনে নেশা ধরাতে পারে না। ওরা হতে চায় সুখের রাজ কুমার, বিপ্লবের সৈনিক হওয়ার আকাঙ্খা থাকে না তাদের।

গাদ্দাররা শিশু নয়, মূর্খ, আহাম্মক বা অবুঝও নয়। এরা সবাই কোন না কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বা অফিসার। এরা শাসন ও সেনা বিভাগের উচ্চ পদের লোক। এরা সাধারণ সৈনিকও নয়।

শত্রুদের সাথে যোগসাজশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সামরিক অফিসাররাই করে থাকে। সৈনিকরা যুদ্ধ করে মরে, তারা গাদ্দার হয় না, বড়জোর ধোঁকায় পড়ে বিদ্রোহের পথে

ধাবিত হয়। কেউ ধোঁকায় পড়লে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া যায়, কিন্তু গাদ্দাররা জেনেবুঝেই গাদ্দারী করে।

গাদ্দারদের সুপথে আনার জন্য আমি ওয়াজ নসিহত করে বৃথা সময় নষ্ট করতে চাই না। কোন শাসক দুর্বল বা দায়িত্বহীন হলে এ পথ অবলম্বন করে। শুধু কথা ও আবেগময় বক্তৃতায় সে জাতিকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। প্রশাসনিক অদক্ষতা ঢাকা দেয়ার জন্য বাগাড়ম্বরকেই সে একমাত্র হাতিয়ার বানিয়ে নেয়। গালভরা বক্তৃতা সরকারের দুর্বলতারই পরিচয় বহন করে।

এ কথা কেবল সরকারের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, তুমি দেখবে, মানুষ যত বড় বিপদে পড়ে তত জোরে চিৎকার দেয়। বড় রকমের চিৎকার, সে যে বেশী রকম অসহায় তাই প্রমাণ করে।

প্রতিপক্ষের মোকাবেলা চিৎকার দিয়ে হয় না, উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে তার মোকাবেলা করতে হয়। ওরা কোন্ পথে কেমন করে কত জোরে আঘাত হানছে সে খবর নিয়ে প্রত্যাঘাত করে জবাব দিতে হয় তার।

আমি জাতির কাছে চিৎকার করে আমার অসহায়ত্ব ঘোষণা করতে চাই না। তাতে জনগণ আরো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। আমাদের অসহায় ভেবে তারা আমাদের দিক থেকে মুখও ফিরিয়ে নিতে পারে। আমি কাজের মধ্য দিয়েই অবস্থার পরিবর্তন করব। জাতি আমার কাছে খাদ্য চাইলে আমি তাদেরকে কথা ও উপদেশ দিয়ে পেট ভরাতে পারব না। গাদ্দারদের আমি তাদের পাওনা শাস্তি থেকে বঞ্চিত করবো না। তুমি মনে রেখো, শত্রুদের আগেই গাদ্দার তার বেঁচে থাকার অধিকার হারায়।

আলী বিন সুফিয়ান! আমাকে শাসনের কাজ রেখে ভাষণের কাজে ব্যস্ত হতে বলো না। যারা বেশী কথা বলে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। মনে রেখো, মিথ্যাবাদীরাই বেশী কথা বলে।'

মিশরে যে বিদ্রোহের আশংকা ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উচ্চপদস্থ কিছু অফিসার ও প্রশাসক ধরা পড়েছে। তাদের শাস্তিও দেয়া হয়েছে। দু'জন নিজেরাই সুলতান আইয়ুবীর কাছে এসে তাদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে। সুলতানও তাদের ক্ষমা করেছেন।

আইয়ুবীর কথাই সত্যি, গাদ্দার ও দেশে অশান্তি সৃষ্টিকারীরা প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর অফিসার পর্যায়ের লোকই ছিল। জাতিকে ও সামরিক বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওরাই গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল।

মিশরে ১১৭৪ খৃস্টাব্দের আগে সৈন্যদের মাঝে বিদ্রোহের নাম নিশানাও ছিল না। ক্রুসেডদের গোয়েন্দা সংস্থা ও দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতার ফলেই মিশরে এ বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল। এখনও তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত আছে, যদিও তা খুবই গোপনে চলছে।

সুলতান জানেন, সহজে এই ধারা বন্ধ করা যাবে না। এ জন্যই সুলতান আইয়ুবী তার গোয়েন্দা বিভাগকে খৃস্টানদের দেশে নিয়োগ করে রেখেছেন, যেন ছোবলকারীদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া যায়। এই সচেতনতা ও পাল্টা আঘাত হানার কৌশল প্রয়োগের ফলেই সুলতান আইয়ুবী বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও নিপূণ যোদ্ধা হিসাবে আজো সমানভাবে স্বীকৃত।

ক্রাক ফিলিস্তিন রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। স্থানটি

গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ, সেখানে ক্রুসেডদের সবচেয়ে বড় পাদ্রী, তাদের মহান রক্ষক থাকে। সেখান থেকেই ক্রুসেডার ও তাদের কমান্ডাররা নির্দেশনা, উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে থাকে।

বলতে গেলে ক্রাকই ছিল ক্রুসেডদের হাইকমান্ডের ঠিকানা। ক্রাককে হেডকোয়ার্টার বানিয়েই তারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে সুলতান আইয়ুবী ও নূরুদ্দিন জঙ্গীর কবল থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা নিত।

সেখানকার অবস্থা জানার জন্য এবং শত্রুদের পরিকল্পনা ও পরবর্তী পদক্ষেপের আগাম সংবাদ জানার জন্য সুলতান আইয়ুবী তিনজন ঝানু গোয়েন্দাকে সেখানে প্রেরণ করে ছিলেন। তাদের কাজ ছিল ক্রাকের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য সংগ্রহ করে নূরুদ্দিন জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছানো। এদের কমান্ডার ছিল ইমরান নামে এক নির্ভীক ও বুদ্ধিমান গোয়েন্দা। এই গোয়েন্দাকে আলী বিন সুফিয়ানই বাছাই করে পাঠিয়েছিল।

এই তিনজন খুব সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আক্রা পৌঁছল। সুলতান আইয়ুবী সুবাক দূর্গ ও শহর জয় করায় সেখানকার অসংখ্য খৃস্টান ও ইহুদী ক্রাকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলমানরা ক্রাকের ওপর আক্রমণ চালিয়ে এই দূর্গ ও শহর যখন জয় করে নিল, তখন সেখান থেকেও ইহুদী খৃস্টানরা বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে গেল। এই দু'টি বিজিত শহর ও দূর্গের আশপাশের এলাকা থেকেই ইহুদী ও খৃস্টানরা পালিয়ে গিয়েছিল।

সৈন্যদের মধ্যেও সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছিল। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশে তাদের মধ্য থেকে

কিছু গোয়েন্দা খৃষ্টানদের ছদ্মবেশ নিয়ে খৃষ্টান এলাকায় চলে গেল। এর মধ্যে তিনজনকে দায়িত্ব দেয়া হল, তারা যেন আক্রা থেকে শত্রুদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ সংগ্রহ করে কায়ারোতে পাঠায়।

তাদের বলা হলো, খৃষ্টান ও ক্রুসেডদের সকল গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জরুরীভাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত ওসব অঞ্চলে মুসলিম শক্তি ও সৈন্যরা এগিয়ে গেলে সেখানকার জনগণের মধ্যে তার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং ওই পরিস্থিতি মোকাবেলায় কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায় এসব ব্যাপারেও তাদের রিপোর্ট করতে বলা হল।

গোয়েন্দা তিনজন বাস্তুহারা খৃষ্টানদের ছদ্মবেশে আক্রাতে প্রবেশ করলো। সে সময় প্রতিদিনই বাস্তুহারা খৃষ্টান ও ইহুদীরা লাইন ধরে আক্রাতে প্রবেশ করছিল।

তাদের চেহারায় ছিল নিরাশা ও হতাশার ছাপ। এসব উদ্বাস্তু আশ্রয় প্রার্থীদের নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য ছিল না। আয় উপার্জনের ব্যবস্থা ছিল না। দু'বেলা ঠিকমত খাবারও কোন সংস্থান ছিল না।

ইমরান ও তার দুই সাথী খৃষ্টান সেজে সেখানে আশ্রয় প্রার্থী হলো। তিনজনই খুব চালাক, সতর্ক ও শিক্ষিত ছিল।

ইমরান সোজা বড় পাদ্রীর কাছে চলে গেল। সে তার বাড়ি এমন এলাকায় বললো, যে এলাকা মুসলমানদের অধিকারে চলে গেছে। নিজেকে সে বিপন্ন ও অসহায় বলে প্রকাশ করলো। খৃষ্ট ধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ও পাগল হিসাবে জাহির করলো নিজেকে।

সে পাদ্রীর সামনে কেঁদে কেঁদে বললো, তার বিবি বাচ্চারা সবাই মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। তার এখন আর কোন পিছু টান নেই। বিবি বাচ্চার জন্য পেরেশানী নেই। সে বললো, 'বাকী জীবন আমি গির্জার সেবায় কাটিয়ে মরতে চাই।'

'তোমার নাম কি?' পাদ্রী প্রশ্ন করল।

সে তার নাম বললো, জন গিস্থার।

'গির্জায় থাকতে হলে যিশুর পুত্র হয়ে থাকতে হবে। দুনিয়ার প্রতি কোন টান থাকলে তো চলবে না।'

'আমি তো চিরকালই দেওয়ানা হয়ে জীবন কাটিয়েছি। দুনিয়ার প্রতি আমার কোন লোভ কোন কালেই ছিল না। বিবি বাচ্চাদের খোঁজ খবরও নিতাম না সব সময়। এ জন্য আমার বিবি ও শিশুরা কাঁদাকাটি করত, আর অভিযোগ করে বলতো, আমি নাকি কোন কাজকর্ম করি না। শুধু আত্মার শান্তির জন্য ছুটে বেড়াই।

একবার এ জন্য আমি খুব বিপদে পড়েছিলাম। আমাদের এলাকায় এক মৌলভী সাহেব ছিলেন। আমার দেওয়ানা হালত দেখে বললেন, 'জন, খোদা তো মসজিদে থাকে, তুমি কোথায় তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছো?' তার কথাবার্তা শুনে খোদাকে পাওয়ার জন্য আমি তো প্রায় ইসলাম গ্রহণই করে ফেলেছিলাম।'

ইমরান পাদ্রী সাহেবকে আরো বললো, 'আমার বিশ্বাস আমার স্ত্রী ও সন্তানরা মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ায়, খোদা তাদেরকে তার শান্তির আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছেন। কারণ আমি এমন অপদার্থ স্বামী ও বাবা ছিলাম, তাদের কোন রুটি রুজির ব্যবস্থা করতে পারতাম না। খোদাই আমার পরিবারের

দেখাশোনা করতেন। আমার সন্তানরা তাদের মাকে ছাড়া থাকতে পারতো না। আমি তাদের সম্পর্কে গাফেল ছিলাম বলে ওদের মা-ই ছিল ওদের একমাত্র আশ্রয়।'

জন গিস্থার কেঁদে কেঁদে পাদ্রীকে বললো, 'মুসলমানরা আমার বিবি ও সন্তানদের হত্যা না করলে আমি হয়তো ইসলাম কবুলই করে ফেলতাম। তারা কেবল তাদেরই হত্যা করেনি, আমার উপরেও অনেক অত্যাচার করেছে। এখন আমি জানি, এই খুনীদের অন্তরে খোদা থাকতে পারে না। মুসলমানদের অন্তরে খোদা নেই, আছে অন্য কোথাও, আছে এই গির্জায়।'

ইমরান সহসা পাদ্রীর কাঁধে হাত দিয়ে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'পবিত্র বাবা! আমাকে বলো, আমি তো পাগল হয়ে যাইনি? বলো, আমি এখন সত্যকে চিনেছি! ঠিক বুঝেছি! বলো, নাহলে আমি আমার জীবন নিজের হাতেই শেষ করে দেবো। আমি পরকালে খোদাকে বলবো, তুমি পথপ্রদর্শক ছিলে না, শুধু ধর্মের নামে ঢং করেছো, লোকদের ধোঁকা দিয়েছো!'

তার মানসিক অবস্থা দেখে ক্রুসেডের মহান রক্ষক চমকে উঠলেন। তিনি ইমরানের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'হে আমার বিপন্ন সন্তান! খোদা তোমার বুকের মধ্যেই আছেন। তিনি তোমাকে খোদার বেটার পুজারীদের মধ্যেই রাখবেন। তুমি খৃষ্টান, জন গিস্থার, তুমি এই ধর্মেই, এই সুরতেই খোদাকে পাবে। তুমি যাও, প্রতিদিন সকালে আমার সাথে দেখা করবে। আমি তোমাকে তোমার অন্তরের খোদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো।'

'আমি আর কোথাও যাব না মুকাদ্দাস বাপ!' ইমরান বললো,

'আমার কোন বাড়ী নেই। দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। আপনি আমাকে আপনার কাছে রাখুন! আমি আপনার ও খোদার বেটার এই গির্জার এমন খেদমত করবো, যেমন আর কেউ করেনি।'

ইমরান ও তার সাথীরা খৃস্টান ও ক্রুসেডদের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য আলী বিন সুফিয়ানের কাছ থেকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়েই এই দুরূহ অভিযানে বেরিয়েছিল। সে জন্য খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কেও তাদেরকে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও জ্ঞান দান করা হয়েছিল। গির্জার আদব, উপাসনার পদ্ধতি এসবের শুধু প্রশিক্ষণই দেয়া হয়নি বরং বারবার অভিনয় এবং রিহার্সালও দেয়া হয়েছিল।

ইমরান এমন নিপূণভাবে সেই শিক্ষা কাজে লাগাল যে, প্রধান পাদ্রী ও তার সাগরেদ দল তার আদবের পরাকাষ্ঠা দেখে তাকে আনন্দের সাথেই গির্জার মধ্যে থাকার অনুমতি দিয়ে দিল।

ইমরান পাদ্রীর খেদমতে নিজেকে এমনভাবে নিবেদন করলো যে, কয়েক দিনের মধ্যেই পাদ্রী তাকে খাস চাকর বানিয়ে নিল। তার বুদ্ধি ও সরলতা পাদ্রীর মন জয় করে নিয়েছিল।

পাদ্রী মনে মনে স্বীকার করল, এই ছেলে অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং তার ওপর ধর্মের ভূত ভালভাবেই চেপে বসেছে। অতএব তাকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

পাদ্রী সাহেব তাকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নিলেন।

o

ইমরানের এক সাথী এক খৃস্টান বণিকের কাছে গিয়ে

নিজেকে ক্রাক থেকে পালিয়ে আসা খৃষ্টান বলে পরিচয় দিল। সেখানে তার সমস্ত পরিবার মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। সে তার বেদনা ভরা কাহিনী এমন করুণ ভাবে বর্ণনা করলো যে, খৃষ্টান বণিক সদয় হয়ে তাকে তার কর্মচারী বানিয়ে নিলো।

সে ছিল সুদানী মুসলমান, নাম রহিম হাংগুরা। ইমরানের মতই সেও ছিল বুদ্ধিমান, সাহসী ও সুশ্রী যুবক। সে এ বণিকের এখানে চাকরী নিল, কারণ সে দেখেছে, এখানে ক্রুসেডদের সৈন্য ও অফিসাররা নিয়মিত আসা যাওয়া করে। এই বণিক সৈন্যদের খাদ্যশস্যও সরবরাহ করে।

কিছুদিন পর বণিক তার কাজে ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে গৃহ কাজেও লাগাতে শুরু করলো।

রহিম বণিকের কাছে তার নাম বলল, ইলিমোর। সে বণিকের পরিবারের সবার সাথেই অত্যন্ত ভাল ও মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলল। অচিরেই সবাই তার ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল।

সে বণিকের স্ত্রী, কন্যা ও ছেলেদের কাছে এমন করুণ ভঙ্গিতে তার ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করতো, যা শুনে ওদের চোখে অশ্রু এসে যেতো।

রহিম তাদের বলেছে, 'আমার বাড়ীও এই বাড়ীর মতই ছিল। এমনি সাজানো গোছানো বাড়ী। এরকমই জৌলুসময় ছিল বাড়ীর আসবাবপত্র। আমার উন্নত জাতের দামী ঘোড়াও ছিল।'

বণিকের মেয়ে আলিসাকে রহিম একদিন বলল, 'তোমার মত দেখতে আমার এক বোন ছিল, তোমাকে দেখলেই

আমার তার কথা মনে পড়ে যায়।'

সে আক্ষেপ করে আরো বলল, 'একদিন আমার বাড়ীর চাকর তার ফাইফরমাশ খাটতো, আমাদের কাজকর্ম করতো। আর আজ কপাল দোষে আমি তোমাদের বাড়িতে কাজ করে খাই। অথচ এমনও দিন ছিল, ক্ষুধার্ত লোকদের আমি বিনা কাজেই খাবার দিতাম।'

বণিকের যুবতী মেয়ে এই সুশ্রী যুবকের প্রতি বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। সে তার বোনের সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করতো রহিমকে।

রহিম বলতো, 'সে প্রায় তোমার মতই দেখতে ছিল। যদি সে মরে যেত তবে কোন দু:খ ছিল না আমার। আমার আফসোস, মুসলমানরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আমি জানি না, এখন তার কি অবস্থা! হয়ত তুমি বুঝতে পারবে।'

'তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেননি?'

'কেমন করে করবো? তেমন কোন সুযোগ তো ছিলনা! তবে তার পর থেকে প্রতিদিনই তাকে উদ্ধারের কথা মনে হয়েছে আমার। আজও আমি চিন্তা করি, তাকে মুসলমানের হাত থেকে কেমন করে উদ্ধার করা যায়।'

'সত্যি খুবই দু:খজনক।' সমবেদনা ঝরে পড়ে আলিসার কণ্ঠ থেকে।

'মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি পাগল হয়ে যাবো। ইচ্ছে করে আবার সেখানে ছুটে যাই, যেখানে আমি আমার প্রাণপ্রিয় বোনকে ফেলে এসেছি। বোনকে হয়তো আর পাব না, কিন্তু তার জন্য মরতে তো পারব! তার কথা মনে হলে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

তার এ ধরনের কথা ও তার বেতাল অবস্থা দেখে মা ও বেটি তাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। এমন মায়াময় যুবকের চেহারায় সে কি বেদনার ছাপ! যৌবন বয়সেই এত বড় আঘাত পেয়ে দিন দিন সে আরো মনমরা হয়ে যাচ্ছে। তার চেহারা বলছে, যদি তার দু:খ লাঘব না হয়, তবে সে পাগল হয়ে যাবে বা আত্মহত্যা করবে।

আলিসা বণিকের অবিবাহিত যুবতী মেয়ে। সে এই যুবকের ব্যথা বেদনা অন্তর দিয়ে অনুভব করে। এমন কি যখন রহিম বাইরে যায়, তখন আলিসাও কোন বাহানা করে বাইরে চলে যায়। সে রহিমকে রাস্তায় পাকড়াও করে বলে, 'বাবাকে বলে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এসো।'

সে রহিমের সাথে কথা বলে আবেগমথিত স্বরে। ভাবে, যদি এতে তার দু:খ কিছুটা হালকা হয়।

মা বণিককে বলে, 'এই ছেলেটির দিকে একটু খেয়াল রেখো।'

রহিমের শরীর স্বাস্থ্য ও চেহারায় একটা আভিজাত্য ছিল। দেখলেই বুঝা যায়, কোন উচ্চ বংশের সচ্ছল পরিবারের ছেলে সে।

রহিম অনেক কসরত করে এমন চালচলন আয়ত্ব করেছিল। সবাইকে আকৃষ্ট করতে পারে এমন আদব কায়দা ও ভদ্রতা শেখা তার প্রশিক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার কষ্ট করে শেখা বিদ্যা আজ কাজে লাগল। তার অভিনয় ও ভাষার মাধুর্যে সহজেই মুগ্ধ হয়ে যেত যে কোন লোক।

তিন চার দিন পর। সেদিন সে বণিকের পাশে বসেছিল। এমন সময় তার আরেক সঙ্গী গোয়েন্দা রেজাউল জাউওয়াকে

দেখলো দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রহিম তার কাছে গেল এবং তার সাথে চলতে চলতে অনেক কথা হলো।

সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি করো?'

'এখনও কোন ঠিকানা হয়ে উঠেনি।' বলল রেজাউল।

রেজাউল একজন অশ্ব বিশেষজ্ঞ ছিল। সে ঘোড়া পালন ও পরিচর্যায় যেমন পারদর্শী ছিল তেমনি চৌকস অশ্বারোহী হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল পরিচিত মহলে।

রহিম তাকে বণিকের কাছে নিয়ে এলো। সে তার নাম বলল ফ্রান্সিস। বণিককে সে জানাল, 'এই খৃষ্টান যুবক ক্রাকে সব কিছু হারিয়ে এখন বিপন্ন, সর্বহারা। একেও কোথাও একটা চাকরী দিয়ে দেন।'

'কিন্তু ওকে কি কাজে লাগাবো?' বলল বণিক।

রহিম বললো, 'সে ঘোড়া লালন পালনের কাজ ভাল জানে। কোথাও ঘোড়ার রাখাল হিসাবে কাজ জুটিয়ে দিতে পারলে হয়।'

বণিক বললো, 'ঠিক আছে, আমার কাছে বড় বড় ফৌজি অফিসাররা আসে, দেখি তাদের ওখানে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি কিনা!'

দু'তিন দিন পর।

বণিকের মধ্যস্থতায় রেজাউল ফৌজি আস্তাবলে চাকুরী পেয়ে গেল। এখানে বিশেষ করে ফৌজি অফিসারদের ঘোড়াগুলোই থাকে।

বণিকের কাছে সবসময় সামরিক অফিসাররা কেন আসা যাওয়া করত অল্প সময়ের মধ্যেই এর কারণ আবিষ্কার করে ফেলল রহিম।

সে জানতে পারলো, এই বণিক একজন ঝানু ব্যবসায়ী। সাধারণ সওদাপাতি ছাড়াও তার কিছু গোপন ব্যবসা আছে। এই বণিক গোপনে এসব সামরিক অফিসারদের মদ ও মেয়ে সাপ্লাই করে। এ কারণে সব বড় বড় সামরিক অফিসাররা ছিল তার হাতের মুঠোয়।

রহিম বণিককে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করতো। কথায় কথায় সে তাদের অভিশাপ দিত এবং আশা প্রকাশ করতো, একদিন ক্রুসেড বাহিনী সমস্ত আরব ও মিশরের উপরে আধিপত্য বিস্তার করবে।

তার কথায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ থাকতো। ক্রুসেড বাহিনী যেন একজন মুসলমানকেও বাঁচিয়ে না রাখে সে জন্য সুযোগ পেলেই অফিসারদের কাছে আবেদন করতো।

কখনও কখনও সে এত বেশী অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে উঠতো যা বলার মত নয়। সে লাগামহীনভাবে বিড়বিড় করে বলতো, আমি আক্রার মুসলমানদের রক্ত পান করবো।'

বণিক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, 'তুমি শান্ত হও। ক্রুসেড বাহিনী তোমার আশা পূরণ করে দেবে।'

সে ক্রুসেড বাহিনীর সেইসব সামরিক অফিসারদের গালমন্দ করত, যারা আক্রায় আরাম আয়েশে বসে আছে।

সে মুসলমানদের হত্যা করার পরিকল্পনা করতো এবং কিভাবে মুসলমানদের পরাজিত করবে তার জন্য এমন সব যুদ্ধ পরিকল্পনা ও নকশা তৈয়ারী করত, যা দেখে বণিক চমৎকৃত হয়ে যেতো।

বণিক সামরিক বাহিনীর অনেক গোপন তথ্য জানতো। মাঝে মাঝে রহিমের উদ্ভট ও নিত্যনতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা দেখে তা সংশোধন করে দিত। তার পরিকল্পনায় কোথায় কি ভুলত্রুটি আছে ধরিয়ে দিত।

এই সব কথার ফাঁকে এমন অনেক সামরিক গোপন বিষয়ও বেরিয়ে আসতো, যে বিষয়গুলো সামরিক অফিসার ছাড়া অন্য কারো জানার কথা নয়।

দিন দিন আলিসা তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। রহিম শুরু থেকেই তাকে তার দায়িত্ব পালনের অন্যতম হাতিয়ার ধরে রেখেছিল।

কিন্তু আলিসার হৃদয় উজাড় করা প্রেম রহিমের অন্তরেও ভা 'বাসার সৃষ্টি করে। রহিম সিদ্ধান্ত নেয়, দায়িত্ব পালন করে দেশে ফেরার সময় সে আলিসাকেও তার সঙ্গে কায়রো নিয়ে যাবে। তাকে মুসলমান বানিয়ে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

কিন্তু তাদের কারো জানা ছিল না, ক্রুসেড বাহিনীর একজন বড় অফিসার তাদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রেখে চলেছে।

রেজাউল জাওয়াও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা ছিল। আস্তাবলে এক বড় অফিসারের ঘোড়া প্রতিপালনের দায়িত্ব পেল সে। সেই অফিসার অনুভব করলো, রেজাউল কোন সাধারণ সহিস বা রাখাল নয়, বরং ছেলেটি তার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান।

যখন অফিসার আস্তাবলে আসে সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আপনারা কবে পরাজিত করবেন?'

আবার হয়তো কখনো জিজ্ঞেস করে, 'সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের মধ্যে এমন কি গুণ আছে যা ক্রুসেড বাহিনীর নেই?

কেন ক্রুসেড বাহিনী মুসলমানদের শেষ করতে পারছে না?'

একদিন সে অফিসারকে এমন কিছু কথা বলে, যাতে অফিসার নিঃসন্দেহ হয়ে যায়, এ লোক একজন সমর বিশারদ না হলেও কোন মতেই তাকে একজন সহিস বলা যায় না। সহিসের মুখ থেকে এমন কথা বের হতে পারে না।

সেই অফিসার তাকে বললো, 'তুমি কে? তোমার পেশা তো সহিস হতে পারে না।'

'আপনাকে কে বলেছে, আমার পেশা সহিস?' রেজাউল বললো, 'আমি ক্রাকে ঘোড়ার মালিক ছিলাম। আমি যদিও সৈন্য বিভাগে ছিলাম না, তবে আমার দুই ঘোড়া যুদ্ধে গিয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ঘোড়ার মালিক এখন আস্তাবলের সহিস!

এতে আমার কোন দু:খ নেই। যে আমার এই দুর্গতির জন্য দায়ী আপনি যদি সেই সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করতে পারেন তবে আমার আর কোন আফসোস থাকবে না। আমি বাকি জীবন আপনার জুতা পালিশ করে কাটিয়ে দেব।'

'সুলতান আইয়ুবীর ভাগ্যে পরাজয় লিখা হয়ে গেছে ফ্রান্সিস!' অফিসার রেজাউলকে বললো।

'কিন্তু কেমন করে?' রেজাউল বললো, 'যদি আপনারা ক্রাক ও সুবাকের উপর আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের অবরোধ করে তাদের পরাজিত করার কথা ভেবে থাকেন তবে ভুল করবেন। মুসলমানরা আমাদের অবরোধ করে যেভাবে জয়ী হয়েছে সেরূপ করে আপনারা যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবেন না।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও নূরুদ্দিন জঙ্গী যুদ্ধের উস্তাদ! তারা আমাদের সৈন্যদেরকে কেল্লা থেকে অনেক দূরেই বাঁধা দেয়ার

ব্যবস্থা করবে।

যদি এমন কোন আক্রমণ করা যায়, যা সুলতান আইয়ুবীর ধারণা ও কল্পনার বাইরে, তবেই সাফল্যের আশা করা যায়। তখন দেখা যাবে, আইয়ুবী ও জঙ্গী কেল্লাতেই বসে আছে আর আপনারা মিশরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে আছেন।'

'তাই হবে!' অফিসার একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললো, 'সমুদ্রে কোন দূর্গ থাকে না, মিশরের সমুদ্র তীরেও কোন দূর্গ নেই। অতএব আইয়ুবী জানার আগেই আমরা মিশরের উপরে খৃস্টীয় শাসন কায়েম করবো।'

এভাবেই তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়! তারপর রেজাউল ঐ অফিসারের কাছ থেকে গোপনে ও কৌশলে আরও অনেক তথ্য আদায় করে নেয়।

শত্রুরা তাদের যুদ্ধের গোপনীয়তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলে বেড়ায় না। সতর্ক ও বুদ্ধিমান গোয়েন্দারা ইশারা ইঙ্গিত থেকেই অনেক বিষয় বুঝে নেয়। নিজের বুদ্ধি বিবেক কাজে লাগিয়ে এমন সব গোপন তথ্য উদ্ধার করে, যুদ্ধের ময়দানে যার মূল্য অনেক।

০

রহিম ও রেজাউল প্রতি রোববার সকালেই গির্জায় যেতো এবং ইমরানের সাথে সাক্ষাৎ করতো। ওখানেই তারা ইমরানের কাছে তাদের গত সপ্তাহের কাজের রিপোর্ট দিত।

রহিম ইমরানকে বললো, 'বণিকের মেয়ে আলিসা আমাকে প্রচণ্ড ভালবেসে ফেলেছে।'

ইমরান বললো, 'তার ভালবাসায় আঘাত দেবে না। আবার এ ভালবাসার খবর পরিবারে জানাজানি হয়ে গেলে কি

প্রতিক্রিয়া হবে তা না বুঝে এ প্রেমের কথা প্রকাশও হতে দেবে না। দিলে তোমাকে ওরা ওদের বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারে।

রহিম, প্রেম করো আর যা-ই করো, সব সময় মনে রেখো তুমি একজন গোয়েন্দা। অসাবধানে তুমি আবার তার ভালবাসায় তলিয়ে যেও না।'

কিন্তু রহিম আলিসার যৌবন ও সৌন্দর্যে প্রায় তলিয়েই যাচ্ছে। আলিসা তাকে এ কথাও বলে দিয়েছে, তাদের বিয়ে শুধু তখনই সম্ভব, যদি সে বাড়ী ও আক্রা শহর থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে। কেননা তার বাবা কোন এক সামরিক অফিসারের সাথে সম্পর্ক করার তালে আছে।

এ অবস্থার কথা অবশ্য রহিম ইমরানকে জানায়নি।

অল্প দিনেই ইমরান পাদ্রী সাহেবের একান্ত আপন ও ঘনিষ্ঠজন হয়ে উঠল। সে এমন নৈকট্য লাভ করল যে, সে পাদ্রীর একজন গোপন পরামর্শ দাতা হয়ে গেল।

পাদ্রীকে সে যে সব প্রশ্ন করতো, তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার ছাপ থাকতো। পাদ্রী সাহেব তার জানার আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে যেতেন। পাদ্রী অবসর সময়েও তাকে ধর্মীয় পাঠ দান করতেন।

তিনি ইমরানের মনে এই কথা বদ্ধমূল করতে চেষ্টা করতেন যে, খৃস্টীয় মতবাদের দায়িত্ব হলো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা। এ উদ্দেশ্য নিয়েই ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে। আর এ জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন তাই ব্যবহার করা হবে।

প্রয়োজনে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হবে। তাদেরকে যে

কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে খৃস্টীয় ধর্মে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

যদি তারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে ইসলামের আদর্শ থেকে সরাতে হবে। মুসলমানদেরকে পাপের সাগরে ডুবিয়ে দিতে পারলেও এ উদ্দেশ্য সফল হয়।

এর জন্য প্রথম কাজ হলো নিজেদের নারীদেরকে এ পথে এগিয়ে দেয়া। "এই নারীরা মুসলিম নারী সমাজকে পথে নামাবে। যুবতী নারীদেরকে লেলিয়ে দিতে হবে মুসলমান যুবক, শাসক, সমাজপতি এবং রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে। এই সব নারীরা তাদের সকল মহত কার্যকলাপ ও শুভ উদ্যোগ বানচাল এবং ধ্বংস করে দেবে।

পাদ্রী ইমরানকে আরো জানাল, ইহুদীরাও মুসলমানদের শত্রু। তারাও তাদের নারী সমাজকে এ কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।

মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য ইহুদী নারীদেরকে এ কাজে সহযোগিতা করতে হবে। মুসলমানদেরকে মুসলিম জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দিতে হবে। দৈহিকভাবে সম্ভব না হলে এভাবেই মুসলমানদেরকে মানসিকভাবে দুনিয়া থেকে উচ্ছেদ করতে হবে।

এ জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, তাই করতে হবে। এ পদ্ধতি খারাপ, নাজায়েজ, উৎপীড়নমূলক, লজ্জাকর এ ধরনের কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না।'১

ইমরান পাদ্রীর কাছ থেকে এসব কথা শুনতো আর এমন ভাব দেখাতো যে এতে সে খুবই খুশি। সুযোগ পেলেই সে এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

পাদ্রীর কাছে সামরিক অফিসার, সরকারী অফিসারসহ সব শ্রেণীর লোকই আসতো।

সে সময় ক্রুসেডদের বড় দুর্দিন। তারা একের পর এক দু'টি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছে।

সেখান থেকে পালাতে হয়েছে খৃস্টানদের। তাদের জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

সে জন্য আক্রা শহর ও দূর্গের প্রতিটি লোকের মুখে একটি কথাই গুঞ্জরিত হতো, 'কবে প্রতিশোধ নেয়া হবে। কবে আক্রমণ করা হবে দুর্বৃত্ত মুসলমানদের।'

পাদ্রীর মহফিলে এ ছাড়া অন্য কোন আলোচনাই ছিলো না। ইমরান সেখান থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলো। সে এটাও জানতে পারল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত উদ্যোগে খৃস্টানরা সক্রিয় হলেও আসলে খৃস্টান সরকারগুলোর মধ্যে কোন ঐক্য নেই।

তাদের বহু সম্রাট ও বহু রাষ্ট্র। সকলেই এক ধর্মের অনুসারী বলে সবাই ক্রুশ চিহ্নের উপরে হাত রেখে শপথ করেছে ইসলামকে ধ্বংস ও নির্মূল করার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের মধ্যে রয়েছে বিশাল ফাটল।

তাদের মধ্যে এমন দেশও ছিল, যারা গোপনে মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করতো আর প্রকাশ্যে খৃস্টান ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতো।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্যার জেমিনুয়েল! সে একটি যুদ্ধের ময়দানে সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর সাথে আপোষ চুক্তি করে যুদ্ধবন্দী বিনিময় করে নেয়।

এরপর স্যার জেমিনুয়েল অন্যান্য খৃস্টান সরকারকেও এ

জন্য গোপনে উস্কানী দিতে থাকে এই আশায় যে, এতে সফল হলে খৃস্টানরা তাকে এককভাবে আপোষকামী বলে অভিযুক্ত করতে পারবে না।

অন্যদিকে সকলের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ চালানোর প্রচেষ্টার সাথেও সে সম্পৃক্ত রইল। এ আক্রমণকে দু'টি অংশে ভাগ করা হলো। একটি আক্রমণ হবে নূরুদ্দিন জঙ্গীর ওপর, দ্বিতীয়টি মিশরের ওপর।

এ সময় নূরুদ্দিন জঙ্গী ক্রাক শহরেই অবস্থান করছিলেন।

পাদ্রী খৃস্টান শাসকদের ফাটলের খবর সবই জানতেন। এ কারণে তিনি খুবই পেরেশানীর মধ্যে ছিলেন।

ইমরান তাদেরকে এ কথা বলতে পারেনি, যে জাতি তার আপন কন্যাদেরকেও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে আপত্তি করে না, সে জাতি একে অপরকে ধোঁকা দিতে আপত্তি করবে কেন?

যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হয়ে যারা ধোঁকা প্রতারণার মাধ্যমে বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখে, তারা তাদের ভাইদের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণার খেলা না খেললে এ খেলায় তারা পারদর্শী হবে কিভাবে?

ইমরান মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, সে সুলতান আইয়ুবীকে জানাবে, যদি মুসলমানদের মধ্যে গাদ্দার না থাকতো, তবে মুসলমানরা খৃস্টানদের পরাজিত করে এতদিনে ইউরোপও জয় করে ফেলতে পারতো। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ও দুশমন হচ্ছে গাদ্দার।

আক্রার পাদ্রী ও খৃস্টান রাজন্যবর্গ এই দুর্বলতায় খুবই সন্তুষ্ট ও তৃপ্তিবোধ করছে। ইমরান জানতে পেরেছে, ক্রুসেডাররা

মুসলমানদের মাঝে পাপাচার আরও বেশী করে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তাদের এ মিশন দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

তারা মুসলমানদের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর শাসকদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে। এই মুসলিম রাজ্যগুলোর শাসকরা গোপনে খৃস্টানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এদেরকে খৃস্টানরা নির্বিবাদে ইউরোপের মদ, অর্থ ও যুবতী সুন্দরী নারী সরবরাহ করে চলেছে।

ইমরান ও রেজাউল সদা সতর্ক থেকে তাদের গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু রহিম দিন দিন দায়িত্ব থেকে গাফেল হয়ে যাচ্ছে। সে এখন সারাদিন চেষ্টা করে, কি করে সব সময় বণিকের বাড়ীর কাজে ব্যস্ত থাকা যায়। আলিসার ভালবাসা তাকে অন্ধ করতে শুরু করেছে। কয়েকদিন পর আলিসা তাকে বললো, 'বাবা এমন এক সামরিক অফিসারের সাথে তার বিয়ে ঠিক করেছে, যার বয়স তার দ্বিগুণ হবে।'

আলিসা রহিমকে আরো বলল, 'যত বড় অফিসারই হোক, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

আলিসা তার মাকে বুঝিয়েছে, সে ঐ অফিসারের সাথে বিয়েতে রাজী নয়। কিন্তু তার বাবা সে কথা মানছে না ; কারণ সে এই অফিসারকে দিয়ে প্রচুর অর্থকড়ি রোজগার করছে। এখন তার কন্যাকে তার হাতে তুলে না দিয়ে তার উপায় নেই।

একদিন আলিসা তার গলায় পরা ক্রুশটি রহিমের হাতে রেখে সেখানে তার হাত চেপে ধরে বলল, 'রহিম, কসম এই ক্রুশের, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।'

রহিমও তার হাতের ওপর হাত রেখে কসম খেয়ে বলল, 'আলিসা, আমিও তোমাকে বাঁচবো না।'

০

একদিন পাদ্রীর কাছে চার পাঁচজন সামরিক অফিসার এলো এবং তার খাস কামরায় গিয়ে বসলো। ইমরান তাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলো, কোন গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিষয় আলোচনার জন্য এসেছে তারা। তারা কামরায় প্রবেশের কিছুক্ষণ পর ইমরানও পাদ্রীর কামরায় প্রবেশ করল। এক ফৌজি অফিসার কথা বলছিল, ইমরানকে কামরায় ঢুকতে দেখেই মাঝপথে কথা থামিয়ে চুপ হয়ে গেল!

পাদ্রী বললেন, 'জন গিল্থার! তুমি কিছুক্ষণ বাইরেই থাকো! আমরা কিছু জরুরী কথা বলছি।'

ইমরান পাশের কামরায় চলে গেলে অফিসার আবার তার কথা শুরু করল। পাশের কামরায় গিয়ে ইমরান দরোজার সাথে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারা কথা বলছিল নিচু স্বরে, তবুও কিছু দরকারী কথা ইমরান বুঝতে পারলো। আর যেটুকু বুঝলো তাতেই তার দফা রফা হওয়ার অবস্থা হলো। ফৌজি অফিসাররা চলে যেতেই ইমরানও সেখান থেকে সরে পড়ল, যাতে পাদ্রীর কোন সন্দেহ না হয়।

সে শুধু কামরার বাইরেই এলো না, গীর্জারও বাইরে চলে এল। তার মনে হলো, এখনি তার এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত এবং কোথাও না থেমে সোজা কায়রো গিয়ে পৌছা দরকার। সুলতান আইয়ুবীকে এ সংবাদ জানানো দরকার যে, আপনার ওপর কঠিন আঘাত আসছে। যাতে তিনি এ আক্রমণ

প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিতে পারেন।

তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা শুরু হলো এবং অস্থিরতা নিয়েই সে পূনরায় গীর্জায় ফিরে এল।

পাদ্রী তাকে দেখে ডেকে এমন এক কাজে লাগিয়ে দিল যে, সে আর তখন পালাতে পারলো না। তা ছাড়া তার মনে পড়ল, যাওয়ার আগে রহিম এবং রেজাউলের রিপোর্টও জেনে যাওয়া দরকার। সে ধারণা করল, এ সংবাদ তাদের কানেও নিশ্চয়ই এসেছে। যদি তাদের কাছে এ খবরের সত্যতা যাচাই হয়ে যায় তবে আর এখানে কারোরই থাকার দরকার নেই। তাহলে তিনজনই একসাথে আক্রা থেকে বের হয়ে যেতে পারে।

পরক্ষণেই তার মনে হলো, এক সাথে রওনা দিতে গেলে দু'একদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। কিন্তু অপেক্ষা করা কি ঠিক হবে? এসব নানা চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলল।

পরের দিনই সে রেজাউলের সাথে দেখা করল। রেজাউল তখন আস্তাবলেই ছিল।

'নতুন কোন খবর পেয়েছিস?' তাকে জিজ্ঞেস করলো ইমরান।

রেজা বললো, 'এখানে অসাধারণ তৎপরতা চলছে। যতদূর বুঝতে পারছি, ক্রুসেডাররা এবার স্থলপথে আক্রমণ চালাবে না। মনে হয়, তারা সমুদ্র পথেই আক্রমণ করবে। কিন্তু এর বেশী আর কিছু জানতে পারিনি।'

ইমরান যতটা জানতে পেরেছিল তার কিছু বললো তাকে। বললো, 'খৃস্টানরা ফয়সালামূলক যুদ্ধ করার জন্যই এ আক্রমণ চালাবে।'

সে রেজাউলকে এই আক্রমণের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ

করার জন্য বলল। ইমরান শুধু তার জানা কথাগুলোর সত্যতার প্রমাণ পেতে চায়। নতুবা বিস্তারিত সে মোটামুটি জেনেই গেছে।

সে রেজাউলকে বললো, 'দু'এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে পালাতে হবে। যে দায়িত্ব দিয়ে আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছিল বলতে গেলে তা পূর্ণ হয়েছে। এখন ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের তিনটি ঘোড়া বা উটের প্রয়োজন।'

'কোথাও থেকে চুরি করা ছাড়া সে প্রয়োজন পূরণের কোন উপায় তো দেখছি না।' বলল রেজাউল।

ইমরান রহিমের সাথেও দেখা করতে চাইলো। তাকেও সতর্ক করে পালানোর কথা বলতে হবে। কিন্তু রাত হয়ে গিয়েছিল বলে সে তার ঠিকানায় যাওয়া ঠিক মনে করল না। কারণ বণিকের বাড়ির ঠিকানায় অন্য কারো যাওয়া উচিত নয়। ইমরান গির্জায় ফিরে এল।

৩

সে রহিমের কাছে গেলেও তার দেখা পেত না। কারণ রহিম তখন তার নির্দিষ্ট ঠিকানায় ছিল না। এমনকি সে আক্রা শহরেও ছিল না। যখন ইমরান তার দায়িত্ব পালনে পেরেশান, সে সময় রহিম পেরেশান আলিসাকে নিয়ে।

এক অবাঞ্ছিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল রহিম। খৃস্টানদের এক ভোজ সভায় মেহমানদের জন্য একটি নাচের আসরের আয়োজন করা হয়েছিল। এ আসরে শরিক ছিল আলিসাও। আলিসার বাগদত্তা তাকে তার সাথে নাচের জন্য বললো। কিন্তু আলিসা তার সাথে নাচতে অস্বীকার করে বসলো এবং তার চেয়ে অল্প বয়স্ক এক যুবকের সাথে নাচতে শুরু করলো। এ

নিয়ে সেই অফিসার তার বাবার কাছে অভিযোগ করলো। তার বাবাও সে মহফিলে ছিল।

সেখানে সমানে মদের বোতল খালি হচ্ছিল। আলিস্যার বাবা মেয়েকে গিয়ে সতর্ক করল। বললো, 'কেন তুমি তোমার হবু স্বামীর সাথে নাচছো না, কেন তাকে অপমান করছো?'

আলিসা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে রাগ করে সেখান থেকে বাড়ী চলে গেল। আসার আগে তার হবু স্বামীকে আসর থেকে সরিয়ে এনে বলল, 'খবরদার বুড়ো, আমাকে বিয়ে করার আশা ছেড়ে দে, কোন বুড়োভামকে আমি বিয়ে করবো না। আরেকবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকালে তোর চোখ আমি তুলে ফেলবো।'

এ কথা বলে সে আর সেখানে দাঁড়ায়নি, হতভম্ব অফিসারের নাকের ডগার ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে বাড়ি চলে এসেছিল।

এ অপমান সইতে পারলেন না অফিসার। তিনি আলিসার বাবাকে খুঁজে বের করে তাকে নিয়ে তাদের বাড়ীতে এলেন। বয়স হওয়ার কারণে অফিসার রাগকে চরমে পৌঁছতে দেননি, বরং মনে মনে কিছুটা মজাও পাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, মেয়ে মানুষ একটু তেজী না হলে জমে না।

বাড়ী গিয়ে বণিক মেয়েকে খুঁজতে গেল তার কামরায়, কিন্তু দেখলো সেখানে সে নেই। খুঁজতে খুঁজতে তাকে গিয়ে পাওয়া গেল রহিমের কামরায়। পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে, গভীর রাতে হবু স্বামী ও পিতার সামনে আলিসা ধরা পড়লো রহিমের ঘরে। ক্ষিপ্ত বাপ পারলে মেয়েকে চুল ধরে টেনে নিয়ে আসে এমন অবস্থা। কর্কশ কণ্ঠে সে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কি করছিস?'

মেয়েও তেজের সাথেই উত্তর দিল, 'আমার যেখানে মন চায় যাবো, যার কাছে ইচ্ছা বসবো। আমাকে নিয়ে কারো মাথাব্যথার দরকার নেই।'

এ রকম জবাব সেই সামরিক অফিসারটির পছন্দ হলো না। তার মনে সন্দেহ জাগলো, 'ডালমে কুচ কালা হ্যায়।' আলিসার বাবাকে সে বলল, 'ওর সাথে রাগারাগি করার দরকার নেই। মেয়েকে নিয়ে ঘরে চলে যান।'

রহিমের ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে যেতেই সেই অফিসার রহিমকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই মেয়েটি এত রাতে এখানে এসেছিল কেন?'

রহিম উত্তরে বলল, 'সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? যে এসেছিল তাকে জিজ্ঞেস করুন?'

'ও কি আজই প্রথম এখানে এসেছে, নাকি আগেও আসতো?'

'তার জায়গায় সে যতবার খুশি আসবে যাবে, সে জন্য কি যার তার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে?'

লোকটি ছিল সামরিক বিভাগের বড় অফিসার। এতক্ষণ সে যে ধৈর্য ধরে রেখেছিল একজন চাকরের এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে তা আর ধরে রাখতে পারলো না। রহিমকে ধমক দিয়ে বলল, 'খবরদার বেতমিজ, সওদাগরের সম্মানে এখনো তোর লাশ পড়েনি, নইলে এতক্ষণে তুই লাশ হয়ে যেতি। কাল ভোরেই তুই এখান থেকে চলে যাবি, নইলে আর কোনদিন জীবিত যাওয়ার সুযোগ পাবি না।'

রহিমের শরীরেও ছিল যৌবনের রক্ত ও ভালবাসার উন্মাদনা। সেও অফিসারের মুখের ওপর জওয়াব দিল, 'আমি

এখানে থাকবো কি থাকবো না তা নির্ধারণ করবে আমার মুনীব। আমার ব্যাপারে অন্য কারো নাক গলানো আমি পছন্দ করি না।'

এ উত্তপ্ত কথাবার্তা হয়তো আরো চলতো, কিন্তু বণিক এসে দু'জনের মধ্যে মিটমাট করে দিল। যাওয়ার আগে অফিসার আলিসার বাবাকে বলে গেল, 'এই লোক যেন আগামী কালের পর আর এখানে না থাকে।'

পরের দিন আলিসার বাবা রহিমকে বললো, 'বাবা, এ ঘটনার পর আর তোমাকে চাকুরীতে রাখা সম্ভব নয়। কারণ সৈন্য বিভাগের এত বড় অফিসারকে অসন্তুষ্ট করলে কেবল যে আমার কারবার নষ্ট হবে তা নয়, প্রাণ নিয়ে বাঁচাও দায় হয়ে যাবে।'

সে রহিমকে উপদেশ দিল, 'তুমি আজই এখান থেকে চলে যাও। কারণ সামরিক অফিসার তোমাকে তার কথামত খুন না করলেও বিনা অপরাধেই কয়েকখানায় পাঠিয়ে দিতে পারে।'

রহিম অতীতের সব কথা ভুলে গিয়েছিল। ভয়ংকর বর্তমান মুছে দিয়েছিল তার সব স্মৃতি। ভুলে গিয়েছিল, সে এখানে কোন দায়িত্ব নিয়ে কেন এসেছিল?

সে আলিসাকে তার জীবনের সাথে জড়িয়ে ফেলেছিল। আলিসার বাগদত্তার ধমকের উচিত জওয়াব দেওয়ার জন্য তার যুবক রক্ত টগবগ করে উঠল। বণিকের দোকান থেকে বেরিয়ে এল রহিম।

প্রথমে রহিম বণিকের বাড়িতে গেল। আলিসার সঙ্গে দেখা করে বললো, 'তোমার বাবা আমাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছে।'

আলিসা বললো, 'আমি তোমাকে বরখাস্ত করিনি। আমার হৃদয়ে তুমি ছিলে, আছো এবং থাকবে। আমি বুঝতে পারছি; এখানে আমাদের থাকা ঠিক হবে না। আমরা দূরে কোথাও পালিয়ে যাবো।'

'কিন্তু কখন, কিভাবে?'

'তুমি আজ সন্ধ্যার সময় এখানে চলে এসো। সে সময় আব্বা বাড়ীতে থাকেন না। লোকজনও সান্ধ্য ব্যস্ততায় থাকে। আজই সন্ধ্যার অন্ধকারে পালিয়ে যাবো আমরা।'

'কিন্তু তোমার আব্বা বরখাস্ত করার পর এখানে আমাদের দু'জনের এক সাথে পথ চলা নিরাপদ নয়।'

'তাহলে আমি তোমাকে শহরের বাইরে একটা ঠিকানা দিচ্ছি, সময় মতো ওখানে চলে যেও। আমি আমার বাবার ঘোড়া নিয়ে যথাসময়ে চলে আসবো।'

রাতে যখন ইমরান রেজাউলের কাছে বসেছিল আর গোপন তথ্য নিয়ে আলোচনা করছিল, রহিম তখন গোপনে শহর থেকে বেরিয়ে আলিসার দেয়া ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যখন ওরা কি করে জীবনের ঝুঁকি এড়িয়ে তিনজনে একত্রে এখান থেকে পালানো যায় সে চিন্তা করছিল, রহিম তখন আলিসাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য শহরের বাইরে তাঁর বলে দেয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছিল।

আলিসা বলেছিল, সে তার বাবার ঘোড়া নিয়ে আসবে। আর তারা একই ঘোড়ার পিঠে দু'জন একত্রে পালাবে।

রহিম অধৈর্য ভাবে আলিসার জন্য অপেক্ষা করছিল, আর ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, আলিসা তার বাবার ঘোড়া কেমন করে চুরি করবে?

আলিসা সময় মতই তার বাবার ঘোড়ার পিঠে জীন বেঁধে তার উপর লাফিয়ে উঠল এবং দ্রুত বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে।

রহিম যখন তাকে দেখলো, তখনো তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, আলিসা এসে গেছে।

আলিসা ঘোড়া নিয়ে রহিমের কাছে পৌঁছলো এবং বলল, 'রহিম, তাড়াতাড়ি উঠে এসো।'

আলিসার আহ্বানে রহিম তার পিছনে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো। কিছু দূর তারা ধীর গতিতে অগ্রসর হলো। শহর ও শহরতলী অতিক্রম করে ঘোড়া থামাল আলিসা। বলল, 'এবার ঘোড়ার বাগ তুমি হাতে নাও।'

রহিম আলিসার হাত থেকে ঘোড়ার বাগ হাতে নিল এবং তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আক্রা থেকে অনেক দূরে চলে গেল।

০

অনেক রাত। তারা এমন এক স্থানে এসে পৌঁছল যেখানে পানি আছে। ঘোড়াকে পানি পান করানো এবং একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘোড়া থামালো রহিম। কারণ সে জানতো, এর পর বহুদূর পর্যন্ত আর পানি পাওয়া যাবে না। তাছাড়া তারা এতদূর চলে এসেছে যে, তার মনে হলো, এখন আর ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই।

আলিসা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসায় তার খোঁজে লোক বেরুবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যে পালিয়েছে এ কথা জানতে সময় লাগবে তাদের। তার ওপর পালিয়ে সে কোন দিকে এবং কার সাথে গেছে কারো জানা নেই। রাতের

অন্ধকারে তারা যে এদিকেই এসেছে এ খবরও জানা থাকার কথা নয় অনুসন্ধানী দলের। এ সব বিবেচনা করেই সে আলিসাকে বললো, 'আজ রাতের মত এসো আমরা এখানেই বিশ্রাম নেই। সকালে অন্ধকার থাকতেই আবার রওনা হয়ে যাবো।'

'তুমি বায়তুল মুকাদ্দাসের রাস্তা চেনো?' আলিসা রহিমকে প্রশ্ন করলো।

তারা আক্রা থেকে বের হওয়ার সময় কোথায় যাবে তার ...গন সিদ্ধান্তই নেয়নি। তাদের তখন উদ্দেশ্য ছিল একটাই, যে কান মূল্যে নিরাপদে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

আ...লিসা বায়তুল মুকাদ্দাসের নাম করলে রহিম বললো, 'বায়তুল মুকাদ্দাসে কেন? আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে তোমার পিছু ধাওয়া করার কারো সাহসই হবে না।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?' আলিসা জিজ্ঞেস করলো।

'মিশরের দিকে!' রহিম উত্তর করলো।

'মিশর?' আলিসা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'সে তো মুসলমানদের দেশ, তারা তো আমাদের জীবিত রাখবে না।'

'মুসলমানদেরকে তুমি জান না আলিসা!' রহিম বললো, 'মুসলমানরা খুবই সদয় জাতি। তুমি গেলেই দেখতে পাবে।'

'না!' আলিসা চমকে উঠে বললো, 'মুসলমানদের আমি ভীষণ ভয় করি। শিশুকাল থেকেই শুনে আসছি মুসলমানরা জঘন্য জাতি। আমাদের মায়েরা শিশুদের ঘুম পাড়ানোর সময় ভয় দেখায়, 'ঘুমোও বাবু ঘুমোও। সাবধান, গোল করো না, ওই যে মুসলমানরা আসছে। টের পেলে ওরা আমাদের জবাই

করে ফেলবে।' না, রহিম, আমি মিশর যাবো না। মুসলমানদের আমি দারুণভাবে ভয় এবং ঘৃণা করি।'

আসলেই সে খুব ভয় পাচ্ছিল। ভয়ে সে রহিমকে জড়িয়ে ধরল, যেনো মুসলমানরা তাকে জবাই করার জন্য এসে গেছে।

আলিসা রহিমকে জড়িয়ে রেখেই বললো, 'আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে চলো। সেখানে সম্মানিত পাদ্রীকে সাক্ষী রেখে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো।'

আলিসা রহিমের বুকে মুখ ঘষছিল, মাথা তুলে বলল, 'বায়তুল মুকাদ্দাস কোন দিকে? আমার দিক সব উলটপালট হয়ে গেছে। তুমি বায়তুল মুকাদ্দাস যাচ্ছো তো?'

'আমি মিশরের দিকে যাচ্ছি।' রহিম আবারো আগের কথাই বললো।

'না, তুমি মিশর যাবে না।' আলিসা জিদ ধরলো এবং কাঁদতে লাগলো।

'কেন, তুমি মুসলমানদের খুব বেশী ভয় করো, তাদের ঘৃণা করো?'

'হ্যাঁ, খুব বেশী ঘৃণা করি।'

'আর আমার সঙ্গে তোমার ভালবাসা?'

'ওকথা বলছো কেন? তুমি জানো তোমাকে আমি আমার জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসি!'

'যদি আমি বলি, আমি মুসলমান! তখন তুমি কি করবে?'

'তখন আমি হাসবো!' আলিসা বললো, 'তোমার রসিকতা আমার বড্ড ভাল লাগে।'

'আমি হাসি ঠাট্টা করছি না আলিসা।' রহিম শান্ত স্বরে ধীরে

সুস্থে বললো, 'আমি আসলেই একজন মুসলমান! তুমি আমার কঠিন ত্যাগের কথা চিন্তা করো, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি কি না করেছি! শুধু তোমার ভালবাসাই আমাকে এ ত্যাগ স্বীকারে শক্তি জুগিয়েছে। আর আমিও খুশী মনে সেই কুরবানী আজো দিয়ে যাচ্ছি।'

'কেমন কুরবানী?' আলিসা বললো, 'তুমি তো আগে থেকেই গৃহহীন, ভাগ্য বিড়ম্বিত এক যুবক। আমাকে নিয়ে সংসার গড়ে তুলতে গিয়ে নতুন করে তুমি আবার কি ত্যাগ করলে?'

'না, তা নয় আলিসা!' রহিম বললো, 'আমি এখন গৃহহীন হয়েছি, তুমি বাড়ী থেকে পালিয়েছ, আমার সাথে বিয়ে করে নতুন ঘর সংসার করবে। কিন্তু আমার তো কোন ঠিকানা হবে না। আমি আমার কঠিন দায়িত্ব থেকে আজ পলাতক। আমি আমার সৈন্য বিভাগ থেকেও বিচ্ছিন্ন। আমি মিশরের গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার! আক্রা শহরে গোয়েন্দাগিরী করতে এসে তোমার ভালবাসায় অন্ধ হয়ে আমি আমার দায়িত্বকে কুরবানী দিয়েছি, আমার কর্তব্য কোরবানী করেছি। আমার চাকরী, পদোন্নতি, উন্নতি, অগ্রগতি সব কোরবানী করেছি।'

'তুমি আমাকে বড্ড ভয় দেখাচ্ছ!' আলিসা হেসে বললো, 'রাখো এসব হেয়ালীপনা। এখন ঘুমিয়ে যাও, আমি তোমাকে জাগিয়ে দিব।'

'আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না আলিসা!' রহিম বললো, 'আমার নাম রহিম হাংগুর, আইলিমুর নয়। আমি তোমাকে ধোঁকার মধ্যে রাখতে চাই না। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, তোমাকে আমি যেখানেই রাখি, সুখে শান্তিতে রাখবো।

তোমার বাবার বাড়ীর মত সুখ শান্তি হয়তো আমি দিতে পারব না, কিন্তু তোমাকে কোন কষ্ট করতে দেবো না। তোমার জীবন আমি সুখ শান্তিতে ভরে দেবো।'

'আমাকে কি ইসলাম গ্রহণ করতে হবে?' আলিসা জিজ্ঞেস করলো।

'তাতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?' রহিম বললো, 'যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে এমন কথা আমার মুখ থেকে কোনদিন তুমি শুনতে পাবে না। আলিসা, এখন এসব কথা থাক, আর সময় নষ্ট না করে শুয়ে পড়ো। আমাদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। কথা বলার সময় অনেক পাবো আমরা।'

রহিম নিজে শুয়ে পড়লে আলিসাও শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর আলিসা রহিমের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু তার মোটেই ঘুম আসছিল না, নানা রকম দুশ্চিন্তা তখন কিলবিল করছিল তার মাথায়।

০

রহিমের ঘুম ভাঙ্গলো। চারদিক তখন ফর্সা হয়ে গেছে। সে আতংকে উঠে বসলো। তার এত বেশী ঘুমানো উচিত হয়নি। সে চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকালো। সেখানে ঘোড়াও নেই, আলিসাও নেই। সে আবারও এদিক-ওদিক দেখলো। শেষে এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালো। মরুভূমির শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়লো না। সে কয়েকবার আলিসা, আলিসা করে ডাকলো। কোনই সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল।

কি ঘটতে পারে ধারনা করতে গিয়ে সে কোন কুল কিনারা পেল না। একবার মনে হলো, কোন লোক কি তাদের পিছু

ধাওয়া করে এসেছিল? সে আলিসাকে ঘুমন্ত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে গেছে? কিন্তু তাই বা কি করে হয়! তাহলে তো রহিমকে জীবিত রাখার কথা নয়! নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করতো বা নারী অপহরণকারী হিসেবে তাকেও ধরে নিয়ে যেতো।

সে খুবই অবাক হলো, লোকেরা আলিসাকে এমন চুপিসারে কেমন করে উঠিয়ে গেল যে, সে একটুও টের পেল না। হঠাৎ আরেকটি চিন্তা মাথায় ঢুকতেই সে একটু ভয় পেয়ে গেল। আলিসা নিজেই পালিয়ে যায়নি তো! সে মুসলমান, এ কথা শোনার পর আলিসার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া কি খুবই অসম্ভব কোন ব্যাপার!

আলিসা যেখানেই যাক বা তাকে কেউ উঠিয়েই নিয়ে যাক, রহিম এই ভেবে অস্থির হয়ে উঠলো যে, সে এখন কোথায় যাবে? আক্রা ফিরে যাওয়া ভীষণ বিপজ্জনক! কায়রো ফিরে যাওয়া আরো বিপজ্জনক। কারণ সে তার ফরজ দায়িত্ব পালন করেনি। তাছাড়া কমান্ডার ইমারনকেও সে কিছু বলে আসেনি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সে সিদ্ধান্ত নিল, সে আক্রাও নয় কায়রোও নয়, সোজা ক্রাকে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে বলবে, তাকে মুসলমান ও গোয়েন্দা বলে চিনে ফেলেছিল বলে কাউকে কিছু না বলেই সে পালিয়ে এসেছে। অবস্থা এমনই প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল যে, রেজাউল বা ইমরান কাউকে সে কোন সংবাদও দিতে পারেনি। তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে গিয়েছিল।

অনেক ভেবে দেখল, এটাই সবচে ভালো কৈফিয়ত। কারণ কেউ এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করবে না, কেউ বলবে না, তোমার কথার যথার্থতা প্রমাণ করো, সাক্ষী পেশ করো।

রহিম পানি পান করে পায়ে হেঁটেই ক্রাকের দিকে যাত্রা করলো। আলিসার অনুপস্থিতিতে সে খুবই মর্মাহত ও বেদনাবোধ করছিল। তার আফসোস হচ্ছিল এই ভেবে, জীবনে আলিসার কোন খবর কি আর পাবো না। এই বিশাল মরুভূমিতে সে কেমন করে কোথায় হারিয়ে গেল!'

সে অতি কষ্টে পায়ে হেঁটে মাইল তিনেক পথ মাত্র অতিক্রম করেছে। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল পেছনে। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সে পেছনে তাকিয়ে দেখলো, ধুলি ঝড় তুলে তার দিকেই ছুটে আসছে ঘোড়া।

সে এদিক-ওদিক দেখলো, কোথাও লুকানোর জায়গা নেই। সে জানতো না, এই আরোহী কারা। আরোহীদের নিয়ে চিন্তার চেয়ে তার নিজেকে নিয়েই বেশী চিন্তা হলো। কি পরিচয় দেবে সে তার নিজের? এই মরুভূমিতে বাহনহীন অবস্থায় সে কি করছে? সে কি খৃস্টান, না মুসলিম? খৃস্টান হলে সে ক্রাকের দিকে যাচ্ছে কেন? মুসলিম হলে খৃস্টান অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে কি করছে সে?

সে ঘোড়ার রাস্তা থেকে একটু সরে গিয়ে হাঁটতে লাগলো। ঘোড়া নিকটবর্তী হলো। এবার সে ওদের চিনতে পারলো, ওরা আক্রার ক্রুসেড বাহিনীর সদস্য।

অশ্বারোহী বাহিনী মুহূর্তে তাকে ঘিরে ফেলল। সে নিরস্ত্র, অসহায়। পালানোর কোন সুযোগই পেল না সে। আরোহীদের দিকে তাকালো সে। তাদের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পারলো। এই সে সামরিক অফিসার, আলিসা যার বাগদত্তা। সে রহিমকে বললো, 'আমারও ধারণা ছিল যে, তুমি খৃস্টান নও।'

তাকে ধরে ফেলা হলো। সে কোন রকম বাঁধাই দিল না তাদের। তারা তার হাত পিঠের দিকে শক্ত করে বেঁধে এক আরোহীর পেছনে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল। ঘোড়া আক্রার দিকে চললো।

ঘটনাটি সেই সময়ের, যখন ইমরান রহিমের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলো সে সেখানে নেই। বণিকের চাকর ইমরানকে বললো, 'তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

ইমরান খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। রহিম গেল কোথায়? কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে তো রহিমের তার কাছেই আসার কথা! কিন্তু সে কেন তার কাছে এলো না?

এসব চিন্তা করতে করতেই ইমরান আবার গির্জায় ফিরে এলো। এক অজানা আশংকায় দুরু দুরু করতে লাগল তার বুক।

###

পরবর্তী বই ক্রুসেড - ৯

উপকূলে সংঘর্ষ

ফেরাউনের গুপ্তধন

পাঠকদের প্রতি--

✓এখন থেকে প্রতি এক মাস অন্তর এ সিরিজের একটি করে বই বেরোবে ইনশাইল্লাহ।

✓ প্রতি খণ্ডের দাম থাকবে ৩০/=।

✓আমরা চাই আপনি আপনার পাশের দোকান থেকেই প্রতিটি কপি সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে দোকানদারকে বই সংগ্রহে উৎসাহিত করুন।

যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে-

✓নিজে আহবায়ক হয়ে অন্তত দশ জন সদস্য নিয়ে 'ক্রুসেড পাঠক ফোরাম' গড়ে তুলুন এবং সিরিজটিকে আরো জনপ্রিয় করতে পরামর্শ পাঠান ও পদক্ষেপ নিন।

✓অগ্রীম টাকা পাঠানোর ভিত্তিতে পাঠক ফোরামকে ৩০% কমিশনে বই সরবরাহ করা হয়। ডাক খরচ আমাদের। পাঠক ফোরাম ছাড়াও বিভিন্ন পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সুযোগ ভোগ করতে পারেন।

✓প্রতিটি খণ্ড বেরোনোর সাথে সাথে পাঠক ফোরামকে জানানো হয়।

বই বিক্রেতাদের প্রতি-

✓জনপ্রিয় এ সিরিজের বই বিক্রি করে আপনিও হতে পারেন প্রচুর লাভবান। এজেন্ট ও বিক্রেতাদের সত্যিকার অর্থেই আশাতীত উচ্চ হারে কমিশন দেয়া হয়।

✓সিরিজটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাওয়ায় আমরা সারা দেশে সহজ শর্তে এজেন্ট নিয়োগ করছি। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাঠক ফোরামকে বই সরবরাহের দায়িত্বও এজেন্টগণ পালন করতে পারেন।

ঘোষণা

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পুনর্জাগরণ। চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন– হত্যা, গুম, খুন, ষড়যন্ত্র। মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে : কিন্তু চীনের অবস্থা? ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই? চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না। আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু

চীনের মুক্তিপাগল মানুষের মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এক নতুন রহস্য সিরিজ–

'অপারেশন'

'অপারেশন সিরিজের' প্রথম বই

আতঙ্কিত নানকিং-এর পর

আগামী মাসে বেরুচ্ছে এ সিরিজের দ্বিতীয় বই :

সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত

ক্রুসেড-৮

ফেরাউনের গুপ্তধন

প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা